মদনভস্মের পর

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড়টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

এই গ্রন্থের একটি কবিতা—'হঠাৎ তোমার চিঠি, আসিবেন ক্রিশ্‌মাসে' কবি-বন্ধু সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগীর লেখা। কবিতাটিকে এই গ্রন্থে স্থান দেবার অনুমতি দিয়ে তিনি আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন।

কলিকাতা : : : : বৈশাখ, ১৩৪৫

"We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams ;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams.
Yet we are the movers and shakers
Of the world forever, it seems"

মদনভস্মের পর

শীতের বেলা হঠাৎ এমন অন্ধকার হয়ে আসে যে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না। তার ওপর আজ সকাল থেকেই আকাশ অকাল-মেঘের আভাস মেলে ধরেচে। আসন্ন অপরাহ্ণে সেই মেঘ-ছায়া যেন ঘনিয়ে এলো, হিন্দু হোষ্টেলের তেতলার একটী ঘরে, আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সুকুমার তা যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। আজকের টেনিস খেলাটা একেবারেই শিকেয় উঠলো—এ কথা মনে করে সে মুহ্যমান হয়ে পড়তে লাগলো। টেনিস খেলার চেয়ে বড় আকর্ষণও অবশ্য আছে এই সহরে; কিন্তু তার জন্যেও টেনিস খেলার এই ভূমিকাটুকু দরকার। টেনিস খেলাটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে একেবারে আপ-টু-ডেট্ ধরণের একটী বাড়ীর প্রাঙ্গণে তার প্রবেশ-অধিকারের ছাড়পত্রও বলতে পারি। অবশ্য খেলা যদি বন্ধই থাকে তাতেও সুকুমার নিরস্ত হবেনা; চুলটী মনোমত করে ব্রাশ করে নিতে পারলেই এখনি ও উঠবে গিয়ে দশ নম্বর বাসে। বাসের ধার ঘেঁষে বসে, মাথাটা ও দেবে হেলিয়ে, সিগারেট কেস খুলে ধরাবে একটা সিগারেট এবং তার পর সেই দ্রুত বিলীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে গড়ে উঠবে অদৃশ্য একটী ভাবমণ্ডল। রিটায়ার্ড মুন্সেফ দক্ষিণাবাবুর বাড়ীর লাউঞ্জে পরিপাটীভাবে সাজানো খানকয়েক

বেতের চেয়ার, দুধের মত শাদা চাদর বিছানো ছোট ছোট খানকয়েক টেব্‌ল্। আশেপাশে মরশুমী ফুলের সমারোহ· ঘাসের সবুজ শাড়ীতে রাশি রাশি ফুল দিয়ে কারা যেন পাড় তুলেচে। কিন্তু ফুলগুলির কোন অর্থই থাকবেনা, যদি সুকুমার সেখানে পৌঁছে শোনে যে কেতকী এইমাত্র বেরিয়ে গেল সিনেমা দেখতে, এই মিনিট দশ-পনেরো আগে।

কেতকী দক্ষিণাবাবুর মেয়ে, বুঝতেই পারচেন। রিটায়ার্ড মুন্সেফের একমাত্র মেয়ে কেতকী যদি মেঘময় শীতের অপরাহ্নে সিনেমাতেই যায়, তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে! কিন্তু সুকুমারের মনে সর্ব্বাগ্রে যে প্রশ্নটীর উদয় হবে তা হচ্চে এই যে, কেতকী গেল কার সঙ্গে? মিত্তিরদের সেই অত্যন্ত স্মার্ট, অত্যন্ত কেতা-দুরস্ত ছেলেটীই কি সন্ধ্যা না হ'তে সকল কাজ ফেলে ছুটে এল আজকে, না সেই কবিযশপ্রার্থী অনুপম হালদার? যেই আসুক, কেতকী অনায়াসে তার জন্য আর একটু অপেক্ষা করলে পারতো। অপেক্ষা করা তার উচিত ছিল, কারণ আকাশে আজ অকালে মেঘ দেখা দিয়েচে, তাদের লাউঞ্জ আর বাগানের মাথার উপর ঘনিয়ে এসেচে অবাস্তবতার অপরিদৃশ্য একটি ছায়া। কড়া কফির পেয়ালা সামনে রেখে সুকুমারের সঙ্গে এই অপরাহ্ন বেলাটী কেতকী যদি অজস্র নিভৃত আলাপে মধুময় করে তুলতো, সে কি সিনেমার সুলভ 'থ্রিলের' তুলনায় কিছু কম লোভনীয় হ'ত?

প্রতিদিন অপরাহ্নে যদিও মেঘ ঘনিয়ে আসেনা এবং কেতকী সিনেমায় যায় কদাচিৎ, তবু সুকুমারের মনের ভাবনাগুলো ছুটে চলে ঠিক এই পথ ধরে। তাই প্রতিদিনই সুকুমার যখন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে শুনতে পায় যে শ্রীমতী কেতকী বাড়ীতেই আছেন, হয় সেলাই করচেন,

নয় পিয়ানো বাজাচ্ছেন, তখন তার মন অপ্রত্যাশিত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুকুমার মনে করে যে এ তার মস্ত বড় সৌভাগ্য, কেতকীর স্পেশাল ফেভার।

আজও সুকুমার সাড়ে পাঁচটার সময় হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দশ নম্বর বাস ধরলে। কিন্তু ইটিলীর বাজার পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই নামলো বৃষ্টি। সুকুমার রেণ-কোট সঙ্গে আনেনি, বৃষ্টির সমারোহে মনে মনে সে প্রমাদ গুণলো। চিন্তিত মনে ধরালে একটা সিগারেট। ভাবতে ভাবতে এইটুকু শুধু সান্ত্বনা পেল যে এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে কেতকী নিশ্চয়ই যাযনি এবং সুধাংশু মিত্র আর অনুপম হালদার বোধ করি অনুপস্থিত রইল আজ কেতকীর চা-চক্রে। বৃষ্টির জলে স্নান করে সুকুমার যখন দক্ষিণাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে পৌছবে, তখন কেতকীর ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসাটা এমন কি অপ্রত্যাশিত? আলমারি খুলে চাকরকে ও যদি একটা নতুন তোয়ালেই বার করে দিতে বলে তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তার পর গরম এক কাপ কোকো বা ওভ্যালটিন, কেতকীর নিজের হাতে তৈরী খানকয়েক স্যাণ্ডউইচ। সুকুমার যদি জিজ্ঞাসা করে, 'এই স্যাণ্ডউইচ নামটা কি করে এলো বলো তো?' কেতকী তার উত্তর দিতে পারবেনা। লর্ড স্যাণ্ডউইচ তাস খেলতে বসে বাড়ী গিয়ে খাবার ফুরসৎ পেতেন না, তাই তাঁর জন্যে এই অভিনব পদ্ধতিতে রুটী আর মাংস জোগাবার বাবস্থা হয়। সেই থেকেই স্যাণ্ডউইচের প্রচলন। কেতকী নিশ্চয়ই এই ছোট্ট ইতিহাসটুকু জানে না। সে কথা তাকে জানিয়ে সুকুমার বিস্মিত করে দেবে। কেতকীর দুই চোখের তারায় জ্বলবে কৌতূহলের আলো; টেবল-ল্যাম্পের ঘষা-কাচের শেড্-বিচ্ছুরিত হালকা আলো এসে পড়বে কেতকীর মুখে, শাড়ী প্রান্তটী অন্য মনে আঙুলে

জড়াতে জড়াতে ও যদি বলে ওঠে, ‘কি ভালো লাগে আপনার—রবীন্দ্রনাথের কবিতা না, কনরাড্ ফাইটের অভিনয় ?’ তা হলেই গল্প উঠবে জমে। সুকুমার হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠবে, তার পর বলবে : প্রশ্ন বড় জটীল হোলো কেতকী। এর চেয়ে যদি বলতে ফ্রেড য়্যাষ্টেয়ারের ষ্টেপিং আর ফুলকপির সিঙ্গাড়ার মধ্যে কোন্‌টা আমার বেশী ভাল লাগে, আমি সহজে উত্তর দিতে পারতাম।

কিন্তু গল্পের খেই হারিয়ে গেল এইখানেই, বাস এসে পড়েচে রুস্তমজী ষ্ট্রীটের মোড়ে। এইবার নামতে হবে সুকুমারকে।

সুকুমার পরিচিত বাড়ীর সামনে যখন এসে পৌছল, তখন বৃষ্টি ধরে এসেচে। কিন্তু বাড়ীর নেপালী দারোয়ানটা আজ তাকে সত্যি চিন্তিত করে তুললো। কেতকী বাড়ী নেই—ওর কোন এক কলেজ-ফ্রেণ্ডের ভাই আসচেন আজ পশ্চিম থেকে, কেতকী গিয়েচে তাঁকে রিসিভ করতে। অবশ্য কেতকীর বন্ধুটীও সঙ্গে গিয়েচেন। বাড়ীতে আছেন শুধু দক্ষিণাবাবু। কড়া বর্ম্মা চুরুট ধরিয়ে নিশ্চয়ই তিনি জ্যোতিষতত্ত্বের জটীল রহস্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়েচেন, কিম্বা হুগলী জিলার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়কার কোন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে অসীম উৎসাহে তাতে নীল পেন্সিলের দাগ দিচ্চেন !

দেখা হলেই তিনি হয়তো বলে উঠবেন, সেকালে বড় বড় সাযেবসুবোরা ফরাসী চন্দননগরে গিয়ে কি জঘন্য কেলেঙ্কারীই না করে গেচেন, বসে বসে পড়চি আর অবাক হয়ে যাচ্চি। বোস, বোস, খানিকটা পড়ে শোনাই তোমাকে—’

কিন্তু সে ইতিহাসের প্রতি সুকুমারের আদৌ কোন উৎকণ্ঠা নেই। ও এখানে অতীতকে রোমন্থন করতে আসেনি, এসেচে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন

রচনা করতে। তবু উপায় নেই, কেতকীর জন্য অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। ও আজ একবার কেতকীকে মুখোমুখি প্রশ্ন করবে: আমায় এমনি করে বিপন্ন করে তুমি কি আনন্দ পাও, শুনি? আজ যদি কাউকে তোমাদের এখানে প্রত্যাশাই করছিলে, সে কথা কাল আমাকে জানিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই তোমার খুব ক্ষতি হোতনা? আমারও অন্য কাজ থাকতে পারে, এটা তোমার জানা উচিত।… মনে ছিলনা? না, না, ও কোন কাজের কথা নয়। আমি এ ধরণের ছেলেমানুষী ঠিক পরিপাক করতে পারিনা।'

অর্থাৎ কেবল এই কথাগুলি নির্ভুলভাবে কেতকীকে শুনিয়ে দিয়েই হোষ্টেলে ফিরে যাবার জন্য সুকুমার দক্ষিণারঞ্জনের সামনে এসে দাঁড়ালো। দক্ষিণাবাবু গলায় অল্‌-উল্‌ কম্ফাটার জড়িয়ে একবার ফুট্‌-বাথ নেবেন কিনা ভাবছিলেন; সুকুমারকে দেখেই বলে উঠলেন, আরে এসো, এসো, একা বাড়ীতে বসে বসে কি বিশ্রীই লাগছিলো। হাতে একখানা পড়বার মতো বই পাচ্ছিলাম না, শেষ পর্য্যন্ত ভাবলাম গালিভার্স ট্র্যাভেলটাই বুঝি আর একবার পড়তে হয়। তুমি এসে বাঁচালে।

সুকুমার তার সামনে এসে পৌছতেই দক্ষিণাবাবু যেন শিউরে উঠলেন।

—কী সর্ব্বনাশ, কোটটা বৃষ্টির জলে একেবারে ভিজে গিয়েচে। খুলে ফেল, খুলে ফেল, এখুনি অসুখ করবে। তোমরা—এই আজকালকার ছেলেরা কেন যে ছাতা ব্যবহার করোনা, কিছুতেই সেটা বুঝতে পারিনে।

চাকরটাকে ডেকে তিনি তখুনি তোয়ালে আনবার হুকুম দিলেন এবং আর এক কেৎলি জল গরম করতে বললেন। ফুটবাথ সুকুমারকেও নিতে হবে, নইলে একদাগ ইনফ্লুয়েঞ্জা মিকশ্চার, স্মিথের বাড়ী থেকে আজ সকালেই তিনি আনিয়ে রেখেচেন।

মাথা মুছে সুকুমার যথন দক্ষিণাবাবুর সামনে এসে বসলো তথন তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুকুমার বিস্মিত হয়ে দক্ষিণাবাবুর দিকে চাইলো।

দক্ষিণাবাবু বললেন, ছাতা ব্যবহার না করার জন্ম তোমায় তিরস্কার করলুম বটে, কিন্তু নিজেও ছেলে বয়সে ও বস্তুটা ঠিক সহ্য করতে পারতাম না। মনে হোত অতিরিক্ত একটা বোঝা। আমরা দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়ি খুব আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু নিজেদের অতীতটা কত অনায়াসে ভুলে যাই দেখেচ!

সুকুমার বুঝতে পারলো যে এইবার তিনি আর একটী প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন। মনে মনে সে প্রমাদ গণনা করলো। হঠাৎ অবনীন্দ্র এসে তাকে বাঁচালে।

অবনীন্দ্র কেতকীর ভাই। কিন্তু এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট নয়। দিবসের প্রারম্ভে যেমন প্রত্যূষ এই গল্পের গোড়ায় তেমনি অবনীন্দ্র।

অবনীন্দ্র সুকুমারের সঙ্গে পড়তো, শুধু পড়তো নয়, একই হোষ্টেলে তারা বহুদিন কাটিয়েচে। তারপর হোষ্টেলের সেই পরিচয়ের সূত্রে একদিন এসে পৌছেচে দক্ষিণাবাবুর বাড়ীর একেবারে ভিতরে। বলা বাহুল্য অবনীন্দ্র যথন হোষ্টেলে থাকতো, দক্ষিণাবাবুর বালিগঞ্জের বাড়ী তথনও তৈরী হয় নি। কিন্তু বাড়ী তৈরী হবার পর অবনীন্দ্র শুধু হোষ্টেলের মায়া কাটালো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন থেকেও নিল ছুটী। দুরন্ত একটা প্রাণীকে কে যেন খাঁচার মধ্যে পুরে রেখেছিল, খোলা পেয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। হোষ্টেলে থাকতেও কোনদিন লেখা পড়ার প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল না; পরীক্ষার কোঠা উত্তীর্ণ হওয়ার চেয়ে স্পোর্টসের কাপ ও পদকগুলির প্রতি তার আসক্তি ছিল একটু বেশী। হোষ্টেলের বাইরে

অবনীন্দ্র রীতিমত পক্ষ বিস্তার করলে। কিছুদিন বোম্বাই এবং কিছুদিন লাহোরে কাটিযে এসে সম্প্রতি ফিরেচে কলকাতায়—কাঁঠাল ভাঙ্গবার মতো একটী মাথা পেলেই ও এইবার ফিল্ম তোলবার চেষ্টা করবে।

ঘরে ঢুকেই অবনীন্দ্র বললে, সুকুমার কতক্ষণ ?

—'এই কিছুক্ষণ' বলে সুকুমার তার মুখেব দিকে তাকালো। অবনীন্দ্রর বেশভূষার পারিপাট্যের প্রসিদ্ধি ছিল কলেজে, এখনও সেটা সে বজায় রেখেচে। এককালে সুকুমারকে নইলে তার একদণ্ড চলতো না, কিন্তু এখন সে নৈকট্যকে পিছনে ফেলে অবনীন্দ্র অনেকদূব এগিয়ে এসেচে। দেখা না হলে সুকুমারকে তার মনেই পড়ে না।

সুকুমাব একটু চুপ কবে থেকে বললে, এঁরা ষ্টেশন থেকে ফিরবেন কখন বলতে পারো ?

অবনীন্দ্র মুখের একটা ভঙ্গি করে জবাব দিল: টাইমটেবল কণ্ঠস্থ করার বয়স গেছে, কখন ফিরবেন কি করে বলি! আমিও এইমাত্র বাড়ী ফিরে শুনচি—

সুকুমার বললে, যিনি তোমাদের অতিথি হয়ে আসচেন, তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয আছে শুনেচি।

অবনীন্দ্র এবার একটা চেযার টেনে নিযে বসলো ; বললে: হ্যাঁ, লাহোরে গিযে প্রথমে তাঁর বাসাতেই উঠেছিলাম বটে।

সুকুমারের চাপা কৌতূহল এবার উচ্ছ্বসিত হযে উঠলো।

তিনিও ছবি তোলেন নাকি ?

দক্ষিণাবাবু বললেন, না, না, ছবি তুলবেন কেন ; লাহোর সনাতন ধর্ম্মকলেজের প্রফেসার। জয়ন্ত রায়—অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্বে অগাধ পণ্ডিত—নাম শোন নি ?

সুকুমার মনে মনে এই অপরিচিত জয়ন্ত রায়ের কাছে যেন ছোট হয়ে যেতে লাগলো ; বললে, না।

দক্ষিণাবাবু বললেন, কেতকীর বন্ধুটির কাছে শুনেচি, অমন ছেলে আজকাল আর হয় না।

অবনী তবু সুকুমারকে রক্ষা করলে ; চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললে : এমন কি আর হাতী-ঘোড়া ! দিন-রাত্রি ছেলে ক্ষেপিয়ে বেড়ান—আজ রাওয়ালপিণ্ডিতে মিটিং, কাল গুজরাণওয়ালায় কন্‌ফারেন্স, সহজ করে কোন কথাই বলতে শেখেন নি বোধ হয়। তবে একটা কথা এই যে, কথা বলে তোমাকে মুগ্ধ করবার যাদু জানেন। একবার ধরে বেঁধে যদি ছবিতে নাবিয়ে দিতে পারি, · খালি চেহারার একটু খুঁত···

দক্ষিণাবাবু এবার রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, অবনী, তুমি বড় অনাবশ্যক কথা বলো। সুকুমারের জন্য এক পেয়ালা চা কি কফির হুকুম করো তার চেয়ে।

অবনী মুখ ভার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল আর সুকুমার সেই ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে জয়ন্ত রায়কে মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো। এ ভাল নয়, ভাল নয়। সুকুমার ভাবলে, নদীর মাঝপথে তার নৌকায় হঠাৎ যেন জল উঠচে, এখুনি যাবে তলিয়ে। প্রখর ব্যক্তিত্ব আর অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে আসচে জয়ন্ত রায়, দক্ষিণাবাবু থেকে কেতকী পর্য্যন্ত সবাই উন্মুখ হয়ে আছে তার আগমনের প্রত্যাশায়। কিন্তু হঠাৎ জয়ন্ত কেতকীদের বাড়ীতেই বা চড়াও হলো কেন? কলকাতার মত সহরে হোটেলের অভাব নেই, পয়সা ফেললে যে কোন জায়গায় থাকা যায়। তবে? সুকুমার কিছুতেই মনকে সদুত্তর দিতে পারলো না। এ দিকে রাত ক্রমেই বাড়চে...প্রায় আটটা হোলো। মোটরে হাওড়া

ষ্টেশন থেকে বালিগঞ্জে পৌঁছানো যে এত সময়সাপেক্ষ তা কে জানতো ?

সুকুমার হঠাৎ উঠে পড়ে বললে, আমি চললুম দক্ষিণাবাবু, রাত ক্রমেই বাড়চে।

দক্ষিণাবাবু একান্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কি, কেন ? এখুনি ওরা সব এসে পড়বে। আমিও ওদের জন্য অপেক্ষা করচি। হঠাৎ তোমাদের কি যে খেয়াল হয় কিছুই বুঝতে পারিনে—

সুকুমার বললে, তা হোক, আমি যাই ··

দক্ষিণাবাবু বললেন, জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ করে যাবে না,—শুনেচি ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে ?

সুকুমার সেই এক সুরে বললে, রাত অনেক হলো—

দক্ষিণাবাবু বললেন, তা হলে আর জোর করে ধরে রাখবো না। কিন্তু কাল আসচো তো ? একটু সকাল সকাল এলে জয়ন্তর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা যাবে।

সুকুমার বললে, কাল বোধ হয় আসতে পারবো না। বাড়ী থেকে জরুরী একটা চিঠি এসেচে, উইক-এণ্ডে ঘুরে আসবো ভাবচি...

দক্ষিণাবাবু ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবু তাঁর সন্দেহ হলো : সুকুমার রাগ করে নি তো ? কিন্তু তিনি কোন কথা বলবার আগেই ঘরের বাইরে একাধিক মানুষের পদশব্দ শোনা গেল, ঘরের প্রবেশ-পথের পর্দ্দাটা উঠলো দুলে। দক্ষিণাবাবু ব্যস্ত হয়ে সেই দিকে যেতে যেতে বললেন : এই যে এসে পড়েচে এরা। তুমি বসো সুকুমার। হঠাৎ চলে যেও না যেন।

এইবার ঘরে ঢুকলো কেতকী, তার বন্ধু লীলা এবং তাদের পিছনে

ছ'ফুট দীর্ঘ একটী ব্যক্তি। শেষের লোকটীই জয়ন্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই। সুকুমার মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিল যে জয়ন্তর পরণে থাকবে খাকী শার্ট এবং শর্ট, তার উপর পুল্ ওভার চোখে চশমা এবং বাঁ হাতে হয়তো বা 'ম্যাসপেরোর' একটা কৌটো এবং ফিলিপ ওপেন্হাম কি উড্হাউসের একখানা নভেল। কিন্তু সুকুমারের কল্পনার সঙ্গে জয়ন্তকে আদৌ খাপ খাওয়ানো গেল না।

জয়ন্তর বয়স অবশ্য খুব বেশী হয় নি, কিন্তু মাথার চুলগুলি বিরল হয়ে এসেচে। পরণে সাদাসিধে একখানি ধুতি, ছাই-রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং খদ্দরেরই মোটা একখানা চাদর। জয়ন্তর হাতে অবশ্য বই একখানা ছিল; কিন্তু সেখানা যখন টেব্লের উপর পড়লো তখন ঠিক ফিলিপ ওপেনহাম বা জি, পি, উডহাউসের সগোত্র বলে মনে হলো না। বইখানার কি একটা খটমট নাম—Ten days that shook the world, না, এমনি ধরণের আর একটা কি।

জয়ন্ত ঘরে ঢুকতেই দক্ষিণাবাবু তাকে প্রায় টেনে চেয়ারে বসালেন; তারপর প্রশ্ন: এত দেরী হলো যে তোমাদের?

জয়ন্ত কোন রকম ভূমিকা না করেই বললে: আমাদের জন্যে যে এতগুলি লোক অপেক্ষা করে আছেন রেলওয়ে কোম্পানী সেকথা ভাবতেই পারে নি। আজ প্রায় একঘণ্টা লেট্।

লীলা বললে, দাদা আজ আর এলেন না মনে করে আমি তো চলেই আসছিলাম। কেতকী অভদ্রতার ভয়ে না-ছোড়বান্দা হয়ে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল, তাই।

দক্ষিণাবাবু পুলকিত কণ্ঠে বললেন, সব ভাল যার শেষ ভাল। এখন বেশ বোঝা যাচ্চে কেতকী অন্যায় করে নি।

জয়ন্ত সায় দিল : না, মোটেই না। ছ' বছর পরে বাংলা মুলুকে এলাম। এঁরা যদি ষ্টেশন থেকে আমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে না আসতেন তা হলে এতক্ষণ হয়তো আমি বাড়ীই খুঁজে পেতাম না।

কেতকী এবার কথা বললে : কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে নষ্ট করবার মত সময় নেই। জয়ন্তদা, আপনি ধরাচূড়া ছেড়ে এখুনি বাথরুমে যান, ভাল করে একটা হট্‌বাথ নিন, এদিকে আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

জয়ন্ত বললে : আমি কিন্তু নিতান্তই বাঙালী কেতকী, হট্‌বাথ আমার পক্ষে too hot. তবে মুখ হাতটা ধোয়া দরকার এবং a cup of hot tea will be much relished. বাথরুমের পর্ব্বটা আমি মিনিট দুইয়ের মধ্যেই সেরে নিতে পারবো।

'চলুন তা হলে'—বলে কেতকী জয়ন্তকে স্নান ঘরের পথ দেখাতে উদ্যত হোলো।

সুকুমারের দিকে দৃষ্টি যে তার পড়ে নি, এ কথা বলা চলে না, কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এখন কেতকীর পক্ষে অসম্ভব। কেতকীর মধ্যে যেন চাঞ্চল্যের জোয়ার এসেচে। অতিথি-সেবা সাঙ্গ না হলে আর কারও সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসর পর্য্যন্ত তার নেই। কিন্তু দক্ষিণাবাবু মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কা বোধ করছিলেন। বেচারী সুকুমার দু'ঘণ্টার ওপর বসে, অন্ততঃ একটা ছোট্ট নমস্কার জানানোও কেতকীর উচিত ছিল বৈকি!

দক্ষিণাবাবু একটু বিব্রতভাবে বললেন, স্নানের ঘরটা লীলাই দেখিয়ে দিতে পারবে, তুমি জয়ন্তর আহারের আয়োজন করো, আর সুকুমারেরও। সুকুমার অনেকক্ষণ এসেচেন।

কেতকী এবার সুকুমারের দিকে চাইলো, তারপর জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললে : এঁর কথাই বলছিলাম আপনাকে জয়ন্তদা, ইংরিজী কবিতা এ পর্য্যন্ত যত লেখা হয়েচে তার বোধ হয় সব এঁর কণ্ঠস্থ।

জয়ন্ত হাত তুলে সুকুমারকে নমস্কার করলো।

—আর ইনি আমাদের জয়ন্তদা, তা বোধহয় বুঝতেই পারচো, ইকনমিক্সে পণ্ডিত, লাহোরের বাঙালী সমাজের একছত্র অধিপতি।

লীলা বললে : দাদার আর একটা নাম আছে কেতকী, সেটা তোমাকে এখনও বলা হয় নি।

কেতকী কৌতূহলে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললে : কি, বলোত শুনি? শিগ্‌গির বলো···

লীলা প্রীতি-প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলে, জয়ন্ত দি গ্রেট—

কেতকীর দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, কিন্তু তার কারণ কি তাতো শুনলেন না?

'বলুন, বলুন'—কেতকীর কণ্ঠে আবার সেই কৌতূহলের বন্যা!

জয়ন্ত নিজের আকৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে : ছ' ফুট সওয়া দু' ইঞ্চি।

কেতকী আর লীলার হাসিতে সমস্ত ঘর যেন অনুরণিত হয়ে উঠলো; দক্ষিণাবাবু পর্য্যন্ত টেব্‌ল্ চাপড়ে বললেন : ব্রেভো, ব্রেভো! কেবল সুকুমার অত্যন্ত অসহায় এবং বিব্রত বোধ করতে লাগলো, জয়ন্তকে প্রতিনমস্কার জানাবার কথাও তার মনে রইলো না।

কেতকী কিন্তু দক্ষিণাবাবুর গোড়ার কথাটার প্রতি মনোযোগ দেয় নি, হাসির ঝঙ্কার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তকে নিয়ে ও গেল স্নানের ঘর দেখিয়ে দিতে।

স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে কেতকীর ফিরে আসা এমন কিছু কঠিন ছিল না, কিন্তু কেতকী তখনই ফিরে এলো না।

সুকুমার কেতকীর জন্য মনে মনে যে সমস্ত কঠিন প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছিল তা যেন প্রতিমুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগলো—তার পরিচ্ছন্ন মুখের উপর যেন কঠিন ভাবনার ছায়া এসে পড়েচে, ফুরিয়ে এসেচে চোখের সমস্ত আলো, নিঃশেষ হয়ে আসচে সমস্ত উৎসাহ ও উত্তেজনা।

হঠাৎ সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। তাড়াতাড়ি হাত তুলে দক্ষিণাবাবুকে জানালে নমস্কার এবং প্রায় করুণ কণ্ঠে বলে উঠলো : আমি চললাম দক্ষিণাবাবু, রাত ক্রমে ক্রমে অনেক হয়ে গেছে, এতক্ষণ আমি লক্ষ্যই করিনি।

দক্ষিণাবাবু শঙ্কা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, সে কি! খেয়ে যাবে না? যাবো বললেই কি হঠাৎ যাওয়া হয়···

সুকুমার জবাব দিল : আজ আমায় ক্ষমা করুন। খেয়ে ফিরতে গেলে হোষ্টেলের দরজাই বোধ হয় খোলা পাব না।

ইতিপূর্ব্বে সুকুমার অবশ্য একাধিকবার রাত করে ফিরেচে—হোষ্টেলের বন্ধ দরজাও তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থায় খুলে গেছে। কিন্তু আজ সুকুমার দক্ষিণাবাবুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে···

দরজা বন্ধ হবার পূর্ব্বেই সুকুমার হোষ্টেলে ফিরে এলো! যাক্, এতদিনে তবু সে হোষ্টেলের রীতিনীতি মেনে চলতে শিখলো। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে সুকুমার ঘরের দরজা খুলে ফেললো। অন্ধকার। অন্ধকার ঘরটী অকস্মাৎ যেন তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেচে। সুকুমার আলো

জ্বাললো না। অগোছাল বিছানার উপর শুয়ে পড়ে, প্রাণভরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে :

যাক্, বাঁচা গেল !

বিছানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘণ্টাখানেক লুটোপুটি খেয়ে সুকুমার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার আকাশ, মেঘ বা কুয়াসার চিহ্ন নেই। সহরের মাথায় শীতের রাত বোধ করি এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিয়ে অনেকদিন দেখা দেয় নি। মেডিকাল কলেজের বাড়ীগুলি পার হয়ে এই আকাশ, ওপেলের মত বিচিত্র এই আকাশ, কতদূর চলে গিয়েচে। সুকুমার পাথরের ষ্ট্যাচুর মত জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথম প্রেমের স্বপ্ন তার দুই চোখে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলেই যে প্রেমকে সুকুমার আবিষ্কার করেছিল বালিগঞ্জের একটী বাড়ীর টেনিসলনে, চায়ের টেব্‌লে, পিয়ানোর রীডের উপর শুভ্র কয়েকটী আঙ্‌ুলের দ্রুত সঞ্চরণে। যে আকর্ষণ তাকে পুরো এক বছর এই কলকাতায় ধরে রেখেচে, এখান থেকে তাকে নড়তে দেয় নি এক পা! এই নগরের জনারণ্যের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ এবং সর্ব্বত্র সে যার উপস্থিতি আর অস্তিত্ব অনুভব করেচে তার মর্ম্মে, সুকুমারের মনে হলো, সে যেন আজ বহুদূরে চলে গিয়েচে, একেবারে তার আয়ত্তের বাইরে। হাত দিয়ে আর তার নাগাল পাওয়া যাবে না, মন দিয়েও না। এবার কি করবে সুকুমার ? সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা দেখবে, না রেস্তর্যাঁয় বসে ক্রিকেটের স্কোর নিয়ে আর পাঁচ জনের মত তুলবে তর্কের তুফান ? সুকুমার তা পারবে না। জনতার সঙ্গে ওর মনের যোগ নেই। ছেলেবেলা থেকে ও মানুষ হয়েচে স্বতন্ত্র পৃথিবীতে। বন্ধু-সংখ্যা তার অনেক, কিন্তু অন্তরঙ্গ নয় কেউ। আর

যাকে সে একান্ত অন্তরঙ্গ মনে করে এতদিন স্বপ্ন রচনা করেচে সেও আজ রইল দূরবর্ত্তিনী হয়ে। যাক্, সামনের ছুটীতে এবার সে বাড়ী যাবে। মা ভাবচেন আর দুঃখ করচেন কত। বড় দিনের ছুটিতেই সে দেশে ফিরবে। এতদিন তার পায়ে ছিল লোহার বেড়ী—'আজ শৃঙ্খল বন্দীরে ছেড়ে আপনি পালায়ে গেছে দূরে।' বিক্রমদেবের মত সুকুমার মনে মনে বললো: একি মুক্তি, একি পরিত্রাণ!

কিন্তু এই মুক্তির আস্বাদ আর পরিত্রাণের আনন্দ ভাল লাগলো, একদিন, দু'দিন···এবং আরও দু-তিন দিন!

এই কটা দিন সুকুমারের কি করে কাটলো তা শুধু সুকুমারই জানে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যে কোন একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ে সময় কাটাবার জন্য তার সে কি করুণ প্রচেষ্টা! সিনেমায় কতক্ষণ আর কাটে, বড় জোর ঘণ্টা দুই, কিন্তু তারপর? মাত্র আটটার সময় হোষ্টেলে ফেরবার কথা মনে হলেই তার দু'চোখ যেন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। অন্যমনস্কের মত একবার ঠিক হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ায়। দশ নম্বর বাসের পথ এইখান দিয়েই বটে, কিন্তু সাহস পায় না যে জোর করে একটা গাড়ীতে উঠে বসবে। কেমন যেন ভয় করে; মনে হয়, কেতকী এতদিনে তার কাছ থেকে কতদূরে চলে গিয়েচে। জয়ন্তর প্রখর ব্যক্তিত্বের উত্তাপে তাদের অর্দ্ধবিকশিত প্রণয় সম্ভাবনার ফুলগুলি এতদিনে ঝলসে মরে যায় নি? নিশ্চয়ই গেছে। নইলে কেতকী ইতিমধ্যে একদিন তার খোঁজ নিত নিশ্চয়ই। একখানা পোষ্টকার্ড কিনতে তিন পয়সাই লাগে সাধারণতঃ, তাতে গোটাকতক লাইন লিখে, পোষ্টবক্সে ফেলবার ব্যবস্থা

করতে সময়ই বা লাগে কতক্ষণ? না, কেতকী, তার জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েচে, অনেক, অনেক দূরে।

সুকুমার সম্প্রতি 'মহুয়া' পড়েছিল। কতদিন সে নিভৃত অবসরে কেতকীকে পড়ে শুনিয়েচে:

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী।

এখন সে কথা মনে হতে তার নিজের উপর রাগ হতে লাগলো। ছি, ছি, কি বোকামীই সে করেছে এতদিন ধরে। প্রজাপতিকে সে চেয়েছিলো হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে, চোখের জল দিয়ে সিঁড়ি তৈরী করে চেয়েছিলো কল্পনার স্বর্গে পৌছতে। সুকুমার মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলো:

মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার;
যাবার সময় হলে যেও সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো;
সংশয় যদি রহে তাতে ক্ষতি নেই,
তবু ভালবাস যদি, বেসো।

ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই, কিছুতেই ক্ষতি নেই, চাঁদ হঠাৎ কুৎসিত হয়ে গেলে ক্ষতি নেই, দিনমানে যদি সূর্য্য না ওঠে তাতেই বা ক্ষতি কি! ক্ষতি নেই? সমস্ত দিনমানের কোলাহল এবং ব্যস্ততার মধ্যে সেই কথাই মনে হয়। কিন্তু হোষ্টেলের ঘরে ঘরে আলো যখন নিভে যায়, ঘর ভরে যায় গাঢ়, শীতার্দ্র অন্ধকারে, তখন পায়রার বুকের মত নরম আর উষ্ণ স্পর্শের জন্য সুকুমার লালায়িত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে সেই ইংরিজী

কবিতার কয়েকটা লাইন, যার বাংলা অর্থ কতকটা এই রকম : তোমাকে সমস্ত শরীর দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কামনা করি বলেই তো তোমার প্রতি আমার এই অপরিসীম ঘৃণা, বিজাতীয় বিদ্বেষ!

এমনি করে দিন পাঁচ ছয় কাটবার পরে হঠাৎ একদিন সুকুমার দেশে যাবার জন্য সুটকেশ গোছাতে লাগলো। যথাস্থানে খবর দেওয়া হয়ে গেলো যে কয়েক দিনের মতো সে বাড়ী যাচ্চে। বেলা তখন প্রায় নটা। চাকরটাকে ডেকে সুকুমার হিসেব চুকিয়ে দিল। ময়লা জামাকাপড়গুলো-একত্র করে ডাইং-ক্লিনিংএ পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। ট্রেণে কোথাও যেতে হলেই সুকুমারের ধূমপানের প্রবৃত্তিটা যায় অসম্ভব রকম বেড়ে। সুকুমাব একটিন সিগারেট এবং আবও কয়েকটা খুচবো জিনিস আনতে দিলো। তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা কবে সেফ্‌টি রেজার আর ব্রাশটা তুলে ফেললো সুটকেশেব মধ্যে। আযোজন সম্পূর্ণ। চাকরটা ফিবে এলে একটা ট্যাক্সি ডেকে বেরিযে পডতে পারলেই হয…

কিন্তু দ্বাবেব বাইরে এক সঙ্গে কতকগুলি পদশব্দ তাকে হঠাৎ চকিত কবে তুললো। কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই, সুটকেশের ডালাটা সুকুমারের হাত থেকে আপনি গেল পড়ে। নাটকের ভাষায হঠাৎ যেন 'স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান!' সুকুমার দেখলো তার ঘবের দরজার সামনে দাঁড়িযে অবনী, তার পিছনে ছয় ফীট সওয়া দু'ইঞ্চি জযন্ত রায় এবং সকলের পিছনে স্বযং শ্রীমতী কেতকী।

সুকুমার কোন কথা বলবার পূর্ব্বেই অবনী ঘরে ঢুকলো এবং জয়ন্ত আর কেতকীর দিকে চেযে বললো : এই নাও তোমাদের আসামী। আমি কিন্তু চললুম ভাই সুকুমার, জরুরী একটা এনগেজমেণ্ট্ আছে এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে। দেখি যদি কিছু টাকা ঢালে ··

অবনী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকলো বর্ম্মা চুরুট টানতে টানতে জয়ন্ত আর তার পিছনে পিছনে কেতকী।

কেতকীর প্রসাধন-পারিপাট্য আজ বিশেষ করে লক্ষ্য করবার,— পায়ের হাই-হিল্ জুতো থেকে হাতের ভ্যানিটীকেস এবং কিউটেক্স-রঙীন উজ্জ্বল নখাগ্রগুলি, কাণের ওরিয়েন্টাল কাণবালা,—ঠোঁটের রক্তাভা এবং গালের রুজ, সব কিছু মিলে আজকের কেতকী যেন সৈনিকে হাতের খোলা, ধারালো তলোয়ার।

জয়ন্তই কথা কইলো প্রথম ; বললে : কি ব্যাপার আপনার বলুন তো ? কোথায় ছুটী নিয়ে এলাম কলকাতায়, দিনকতক আপনাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে খাঁচার পাখী খাঁচায় ফিরে যাব ; আর আপনি একেবারে নিরুদ্দেশ !

সুকুমার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা গেঞ্জি টেনে গায়ে দিতে লাগলো।

কেতকী বললে, কি হয়েচে তোমার ?'—স্বরটা তার রীতিমত রুক্ষ এবং গম্ভীর।

কি কৈফিয়ৎ দেবে সুকুমার ঠিক করতে পারছিলো না ; হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : আমি বাড়ী যাচ্চি—সেখানে খুব অসুখ···

কেতকী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, কা'র ? কার ?

তার কণ্ঠের কঠিনতা গলে আর্দ্র হয়ে এসেচে !

কিন্তু সুকুমার পড়লো মুস্কিলে ; কাল্পনিক অসুখের বোঝাটা যে কার ঘাড়ে চাপাবে তা সহজে ঠিক করতে পারলে না। ইতিমধ্যে জয়ন্ত যেন

সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে নিলো। হঠাৎ প্রবল হাসির শব্দে হোষ্টেলের ঘরখানা মুখর করে তুলে জিজ্ঞাসা করলো : খুব অসুখের খবরটা বোধ হয় সত্যি নয় কেতকী ; তা হলে সুকুমারবাবু নিশ্চয়ই এই কটা দিন চুপচাপ কলকাতায় বসে থাকতেন না। তল্লাস করে দেখ ব্যাধির ঠিকানাটা কোথায়, তোমার হাতের কাছেই নয়তো ?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেও কেতকীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো না, কিন্তু সুকুমার উঠলো রেগে। জয়ন্তর দিকে চেয়ে সুকুমার বললে : আপনার সঙ্গে বোধ হয় ঠাট্টা-তামাসার সম্বন্ধ আমার নয়।

আর কেউ বুঝি ক্ষুণ্ণ হতো সুকুমারের কথায় ; কিন্তু জয়ন্ত নির্লিপ্ত-ভাবে জবাব দিল : নিশ্চয়ই নয়। এবং সম্বন্ধ বিগর্হিত কোন কথা তো আমি বলিনি সুকুমারবাবু, আপনি রাগ করচেন কেন ?'—তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকেই জয়ন্ত আবার বললো : যাক গে সে কথা। আমার এক বন্ধু থাকেন মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে। দেখে আসি যদি তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। ইতিমধ্যে, Let your bugles sing truce at the break of the day.

হাসতে হাসতে জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যেতে যেতে দেখলো সুকুমারের ঘরের আশেপাশে কতকগুলি কৌতূহলী মুখের ভিড় লেগে গেছে। জয়ন্তকে দেখেই তারা অন্তর্ধানের উপক্রম করছিল। কিন্তু জয়ন্তর সাবধানী দৃষ্টিকে তারা এড়াতে পারলো না। চুরুটে গভীর একটা টান দিয়ে হাসতে হাসতে জয়ন্ত বললে : ভয় নেই, ভয় নেই। আমি সুকুমারকে রিপোর্ট করবো না। যুদ্ধ এবং প্রেম, এই দুইক্ষেত্রে কিছুই অন্যায় নেই, এতো আপনারা পড়েচেন।

জয়ন্ত খানিকটা এগিয়ে গেলো, আবার তখুনি ফিরে এসে বললে :

দেখুন, আপনাদের বন্ধুবর যদি খোঁজ করেন, তা হলে বলবেন যে আমি নিচের ফুটপাথে তাদের জন্য অপেক্ষা করচি।

জয়ন্ত এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষ তখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক! সুকুমার ভাবচে, কেতকী যদি এবার তাকে পরিহাসের সুরে কোন প্রশ্ন করে তা হলে কতকগুলি বাছাবাছা কঠিন কথা সে শুনিয়ে দেবে। হোষ্টেলে ছুটে এসেচে বলেই কেতকীকে সে খাতির করবে না। তার আসা উচিত ছিল অনেকদিন আগে। আর কেতকী? তার আশেপাশে চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি, দ্বারের বাইরে ফিসফাস কথাবার্ত্তা!

সাধারণ বাঙালী মেয়ের পক্ষে এতে বিব্রত বোধ করা মোটেই বিস্ময়কর হোত না, কিন্তু কেতকীর শিক্ষা-দীক্ষা তাকে এ-সব ছেলেমানুষী দুর্ব্বলতা-গুলি জয় করতে শিখিয়েচে। কেতকী অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সুকুমারের মুখের কথার অপেক্ষার!

ছেলেদের মধ্যে কে যেন বাইরে থেকে বলে উঠলো: ভদ্রলোক তোমাদের জন্য নিচে অপেক্ষা করচেন। মেক হেষ্ট্, বয়।

খোলা দরজাটা ঈষৎ ভেজিয়ে দিয়ে সুকুমার বললে, কি বলতে চাও বলো—

কেতকী বললে, কি ছেলে মানুষীটাই করলে তুমি! ছিঃ—

সুকুমারের আহত আত্ম-সম্মান আবার গর্জ্জে উঠলো!

—ছেলেমানুষীটা কিসের শুনি?

—এর চেয়ে ছেলেমানুষী আবার হয় নাকি! জয়ন্তদা এসেছেন, ওঁর এক পিসতুতো বোনকে বাঁকড়ো থেকে নিয়ে এসে এখানে রেখে যেতে। কদিন ধরে তোমায় খুঁজচেন তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে!

—আমার প্রতি হঠাৎ তাঁর এত অনুগ্রহ কেন ?

—একা তাঁর ট্রেণে যেতে ভাল লাগে না, সঙ্গী চান একজনকে।

—কিন্তু সেই পাঞ্জাব থেকে এতদূর একা একা এলেন কি করে ?

—তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই ; জয়ন্তদা নিচে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, তৈরী হয়ে নাও—

—কোথায় যেতে হবে শুনি ?

—এতকাল যেখানে তোমার রেগুলার এটেন্‌ডেন্স ছিল !

—সব সময় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, কেতকী।

—সে ত জয়ন্তদা ঘরে থাকতেই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েচো। কিন্তু ঠাট্টা নয়, সত্যি। এখুনি যেতে হবে তোমাকে।

—কিন্তু আমার কাপড় জামা যে সব বাক্সের মধ্যে—

—আমি খুলে বা'র করে দিচ্চি—

—না থাক, ধন্যবাদ···

—কেন, ইতিমধ্যে অনেকগুলো কবিতা লিখেচ নাকি—আমাকে দেখাতে ভয় ?

—তুমি বড্ড দুষ্টু হয়ে উঠচো কেতকী···কিন্তু, আমার চাকরটা যে এখনও এসে পৌছল না। সিগারেট আনতে গেছে কোন্ কালে ! বাস চাপা পড়লো নাকি পথের মাঝখানে···

কেতকী বললে, চাকরটা সম্বন্ধে তোমার যতখানি দুশ্চিন্তা, ততখানি যদি আমাদের জন্যে ভাবতে !···কিন্তু, সত্যি আর দেরী করা চলে না, তুমি এখুনি তৈরী হয়ে নাও···

বালিগঞ্জের বাড়ীতে সুকুমারের এই কদিনের অনুপস্থিতিতে কেতকী যে বিশেষ বিমর্ষ হয়েছে, এমন কথা মনে করবার কোন প্রমাণ পাওয়া

গেল না। মনে হলো, সুকুমারের উপর তার দাবীটা যেন স্বতঃসিদ্ধ। যেতেই হবে সুকুমারকে।

একটু ইতস্ততঃ করে সুকুমার বললে, কিন্তু এখানে বলে যাব কি?

—যা বলে যাচ্ছিলে, ঠিক তাই। অর্থাৎ, ট্রেণ-যাত্রার যোগটা তোমার কপালে আজ অব্যর্থ!

এরপর দুজনেই হাসলো একটু মিষ্টি করে এবং সেইখানেই ঘটলো মনান্তরের ইতি। সুকুমার এই কয়দিন ধরে তার মনের মধ্যে কড়া কড়া যে শব্দগুলি চয়ন করে রেখেছিল তার একটীও আত্মপ্রকাশের পথ পেল না। কেতকী যদি অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে তার কাছে মার্জ্জনা চাইতো, তাহলে সুকুমার হয়তো বা জোর করে কিছু বলতে পারতো! কিন্তু এ মেয়ে অনুনয় করে না, ক্ষমা চাইতে জানে না; তার দাবী তার রূপের মতই প্রখর, দীপ্যমান! চুম্বকের মতো সে তার প্রণয়াস্পদকে টেনে নিয়ে যেতে চায়!

বর্দ্ধমানের পর থেকে মাটীর চেহারাই যেন আর এক রকম। এখনও বেলা আছে, কিন্তু মাটীতে এরি মধ্যে ফুটেচে ধূসর রঙ, গাছপালাগুলো যেন বিবর্ণ, শ্রীহীন। ট্রেণের থার্ড ক্লাসের কামরায় দেখা গেল জয়ন্ত আর সুকুমারকে। জয়ন্ত বইয়ের পাতার মধ্যে তলিয়ে গেছে, ট্রেণের দুরন্ত গতি, যাত্রীদের কোলাহল, এ-সবের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আর সুকুমার? জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দ্রুত ধাবমান গাছ-পালা, টেলিগ্রাফ পোষ্ট, ডিষ্ট্যাণ্ট সিগনাল, ঘর বাড়ী, পুকুর, মাঠ এবং আরও

অনেক কিছু সুকুমার ক্রমান্বয়ে দেখে চলেচে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাচ্চে কেটে, মাইলের পর মাইল যাচ্চে পার হয়ে···সুকুমারেরর মুখে লাগচে শীতের অপরাহ্ণের মিষ্টি রোদ, হালকা হাওয়া, ট্রেণের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চেতনা যেন উঠচে দুলে। ষ্টেশনে কেতকী তাকে চুপি চুপি কি একটী কথা বলেছিল, কৃপণের মতো তাই উপভোগ করচে মনে মনে। কথাটা কিছুই নয়, নিতান্ত ছেলেমানুষী একটা ঠাট্টা যা কেতকীর মুখে প্রায়ই শোনা যায় না, কিন্তু সুকুমারের কাছে তারই মধ্যে কি গভীর ইঙ্গিত, কি বিপুল রহস্য! একটীর পর একটী সিগারেট যাচ্চে পুড়ে, টিনটা প্রায় খালি হয়ে এলো। তা হোক, সুকুমারের কাছে আজ পৃথিবীর সব কিছুই যেন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য নিয়ে উপস্থিত, তার চারিদিকে যেন দুটী পরিচিত দৃষ্টির অলক্ষ্য ইসারা।

হঠাৎ বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে জয়ন্ত বললে, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়তে পারে, একটু সরে বসো সুকুমার!

বলতে ভুলেছি, জয়ন্ত ইতিমধ্যে সুকুমারকে 'বাবু' বর্জ্জিত করেচে আর সুকুমার ছয় ফুট সওয়া দু ইঞ্চি এই লোকটীকে বলতে সুরু করেচে 'জয়ন্ত-দা!'

সুকুমার সরে বসলো জানালার কাছ থেকে; তার পর বললে, এমন জানলে আমি কিন্তু আসতাম না আপনার সঙ্গে।

অপরাধ?

একা একা এমনি বসে থাকতে কতক্ষণ ভাল লাগে? আপনি তো বই নিয়েই মশগুল্।

ঘোরতর অপরাধ সন্দেহ নেই; কিন্তু উপায় কি? 'হণ্ট্' করবার মতো একটী মিষ্টি মুখের কথাও যে ভাবতে পারি না।

কিন্তু মিষ্টি মুখের কল্পনাও যে ক্রমশঃ একঘেয়ে হয়ে আসচে জয়ন্তদা, দেরী কতো আর ?

বেশী নয়। ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেণ পরিত্যাগ, তারপর নৌকাযোগে দামোদর লঙ্ঘন এবং তারপর গো-শকট যোগে একেবারে পুরপ্রবেশ !

গো-শকটের কল্পনায় সুকুমারের উৎসাহ যেন সত্যি সত্যি নিস্তেজ হয়ে এলো। সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে: গো-শকটের পর্ব্বটা চুকবে কতক্ষণে শুনি ?

আধ ঘণ্টার মধ্যেই—বলে জয়ন্ত হাসলো; তারপর বললে: কিন্তু গরুর গাড়ীর নাম শুনে তোমার ভয় পাওয়া অন্যায়। আমাদের দেশের অবস্থাটা এখন ঠিক গরুর গাড়ীর মতো, একথা মানো তো ?

কেন ?—সুকুমার প্রশ্ন করলে।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, নয় ? দেখছ না, সকল দিক দিয়ে কেমন করে আমরা পিছিয়ে পড়চি ? সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু গাড়োয়ানদের মত গরু ঠ্যাঙ্গাবার উৎসাহ আছে প্রচুর ! গরু বলতে তোমরা আমরা এবং গাড়োয়ান অর্থে আমাদের নেতারা। তাঁদের পলিটিক্স গরুর গাড়ীর পলিটিক্স—এ তোমায় বলে রাখলুম।

কেতকীর কাছে সুকুমারের শোনা ছিল যে রাজনীতি চর্চ্চায় এ লোকটীর উৎসাহ অসাধারণ, কৌতূহলী হয়ে সুকুমার জয়ন্তর মুখের দিকে চাইলো।

জয়ন্ত হাতের বইখানা নামিয়ে রেখে বললো: আমাদের দেশের জন্য নেতারা যে মুক্তির কল্পনা করে রেখেচেন তা কি রকম জানো ? তাতে পায়ে হেঁটে যাওয়া হয় না, তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের নাগালও মেলে না। সাধু

সঙ্কল্প আছে ঢের, সৎসাহস নেই মোটে। যিনি তোমাদের দেশের রাজনৈতিক রণস্থলে আজও আড়াল থেকে বাণ বর্ষণ করে চলেচেন, তিনি গরীব আর ধনীদের নিয়ে রামরাজ্য গড়ে তুলবেন, এ কথা শোনো নি? রামরাজ্য—কিন্তু গরীবও থাকবে, ধনীও থাকবে, এ কথাটা ভুলো না সুকুমার। এক কথায কাঁঠাল দিয়ে তৈরী হবে চমৎকার আমসত্ত্ব।

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠলো; ট্রেণের লোকগুলো তাকালো একবার তার দিকে। কিন্তু জয়ন্তর তাতে কিছুই যায় আসে না। জয়ন্ত বললে, এর চেয়ে সোজাসুজি বলা ভালো যে আমরা পায়ে হাঁটবো, নয়তো, চড়বো মোটরে;—গরুর গাড়ী নয়, ঘোড়ার গাড়ী নয়, একেবারে আপটু-ডেট্ সিক্সসিলিণ্ডার! দু নৌকোয় পা দিয়ে কোন জাত শক্তির আস্বাদ পায় নি। হয় জার্ম্মাণী, নয়তো রাশিয়া, হয় মুসোলিনি, নয় তো লেনিন্। এর মাঝামাঝি দাঁড়াবার স্থান নেই।

শীর্ণ, দীর্ঘদেহ এই মানুষটির কথাব মধ্যে যে এতখানি মারাত্মক আকর্ষণ থাকতে পারে, সুকুমার ইতিপূর্ব্বে তা কল্পনা করতে পারেনি। কথাগুলি বলবার সময় জয়ন্তর শিরাবহুল আঙুলগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, উঠেছিল অস্বাভাবিক কঠিন হযে। তার শ্যামবর্ণ, রুক্ষ মুখের উপর হঠাৎ যেন খানিকটা আলো এসে পড়েছিল, চোখ দুটী উঠেছিল উজ্জ্বল হযে। সুকুমার মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো তার দিকে, মুহূর্ত্তের জন্য কাণে কাণে বলা কেতকীর সেই কথাগুলিও যেন সুকুমার ভুলে গেল। জয়ন্ত লক্ষ্য করলে। আবার তেমনি করে একদফা হেসে নিয়ে বললে, থাকগে দেশের কথা। গালাগালি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। ব্যাগটা খুলে একটা কড়া চুরুট দাও, মগজ থেকে দেশের দুঃখ ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাক—

মাঝামাঝি একটা ষ্টেশন এসে পড়েছিলো, ট্রেণ থামলো কয়েক মিনিটের জন্য। যাত্রীদের ওঠা-নামার ব্যস্ততা, ষ্টেশনের ফেরিওয়ালাদের চীৎকার …তারপর আবার ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা, গার্ডের হুইস্‌ল্‌, আবার সেই গতির বেগ!

জয়ন্ত চুরুটে পরিপূর্ণ একটা টান দিয়ে বললে: আমরা যে কত পেছিয়ে আছি তা সহরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। যদিও কিছুকাল আমি গ্রাম ছাড়া, তা হলেও কিছু কিছু জানি আমাদের গ্রামগুলিকে। একদিকে যেমন প্রচণ্ড দারিদ্র্য, আর একদিকে তেমনি ভয়ানক দুর্ব্বুদ্ধি! সেই গরুর গাড়ী। ধর ললিতার কথাই তোমাকে বলি। আমার পিসতুতো বোন, বয়স প্রায় যোলো সতেরো। ছেলে বয়সে বাপ গেল মারা, বিধবা মায়ের হাত ধরে উঠলো গিয়ে গ্রামের বাড়ীতে। সম্পত্তি বলতে ললিতার বাপ ক'খানি মেটে ঘরই রেখে গিয়েছিলেন—কোনটীতে টিনের চাল, কোনটীতে খড়ের ছাউনী—গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখতে পাবে। তবু মাথা গুঁজবার একটা আশ্রয়! দুঃখের দিন কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল, মাসখানেক আগে ললিতার মাও গেলেন মারা। অজস্র দুঃখের মধ্যে ললিতা একরাশ রূপ পেয়েচে। কিন্তু ভেবো না যে এই রূপের জোরে সে সুখের মুখ দেখলো। ঠিক তার উল্টো। ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ে, গ্রামের ছেলে-বুড়োর পক্ষে এই দৃশ্য দেখা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। ললিতার মায়ের দুর সম্পর্কের এক দেওর ওদের দেখা-শুনো করছিলেন। এখন শুনচি ললিতার ভয়ে তিনিও ও বাড়ীর সংস্পর্শ ত্যাগ করেচেন। দিন পনেরো আগে ললিতার চিঠি পেলাম। তাকে নিয়ে আসতে লিখেচে, নইলে হয়তো বা গলায় দড়ি দিয়ে মরবে এমন কথাও জানাতে ভোলে নি। আরও অনেক কথাই লিখেছিল ললিতা—চমৎকার হাতের

লেখা, চিঠি লেখবার কি সংযত ভঙ্গি। খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম তাকে, ভাল করে মনেও পড়ে না আজ। কিন্তু ছোট্ট সেই চিঠির মধ্যে দিয়েই তাকে যেন নতুন করে দেখলাম। মনে হোল, ষোল বছরের অনূঢ়া মেয়ে আমাদের গ্রামের জীবনে যতই দৃষ্টিকটু হোক, তাকে এমনি ভাবে নষ্ট হতে দেবো না; তাইতো তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম পাঞ্জাব থেকে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে কেতকীর কাছেই দেব রেখে। তারপর, তুমি, আমি, দক্ষিণাবাবু···সকলে মিলে একটা উপায় স্থির করা যাবে তার সম্বন্ধে···

সন্ধ্যার মুখে তারা নৌকায় দামোদর পার হলো। বর্ষায় দামোদরের যে দুরন্ত জলধারা তীরবর্ত্তী গ্রামগুলিকে বিপন্ন করে তোলে, শীতের সন্ধ্যায় তার শান্ত, সংযত রূপ দেখে বিস্মিত হতে হয়। মাথার উপরে ইতিমধ্যে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেচে। চাঁদের হালকা আলোয় বহুদূর বিস্তৃত বালুতট কত উদাস, কত করুণ মনে হয়। দেখতে দেখতে তারা অপর পারে এসে পৌছল। খানিকটা যেতেই মিললো গরুর গাড়ী, তারপর সুরু হলো পুনর্যাত্রা!

গাড়ী চলেচে ঝিমুতে ঝিমুতে—আঁকাবাঁকা অসমতল পথ ধরে। পথের দুধারের বন জঙ্গলের মধ্যে ঝিঁঝির অশ্রান্ত ঐক্যতান, মধ্যে মধ্যে জোনাকী পোকার ঝিকিমিকি। একটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ফাঁকা মাঠের প্রান্তে, নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত। গরুর গলার ঘণ্টা বেজে উঠচে ঠুন্ ঠুন্ করে। চারিদিক যেন রহস্যময়, ঘুমে ভরা। সুকুমারের বাড়ীও অবশ্য কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, তবু সেটা মহকুমার সদর, সন্ধ্যা নামবার পরেই চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে না, ছেলেরা রাত্রি ন'টা দশটা পর্য্যন্ত পথে পথে হৈ চৈ করে বেড়ায়, ক্লাবে গিয়ে ব্রীজ খেলে, প্রতিমাসে একখানা করে নতুন নাটকের মহলা দেয় (যদিও অভিনয় করে কদাচিৎ)!

হঠাৎ জয়ন্ত বললো, তুমি গান গাইতে জানো সুকুমার ?

সুকুমার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো, কেন বলুন তো ?

জয়ন্ত বললো, সুরের সঙ্গে আমার কণ্ঠের জন্মগত বিরোধ, কিন্তু কাণ একেবারে তৈরী। যদি গাও তার রস উপলব্ধিতে এতটুকু বাধা ঘটবে না।

কিন্তু গান আমি জানি না জয়ন্তদা !

—আমারই সগোত্র তা হলে। আচ্ছা আবৃত্তি কবো, ইংরিজী কবিতা সম্বন্ধে তোমার দখল অসম্ভব এ তো কেতকীর মুখেই শুনেচি। আচ্ছা, তোমাদের বাংলা ভাষায় এমন কোন কবিতা লেখা হয়েচে বলতে পারো, যার সঙ্গে এর তুলনা হয় :

O restless, restless race !
O beloved race in all ! O my breast aches with tender
Love for all !
O I mourn and yet exult, I am rapt with love for all,
Pioneers ! O Pioneers !

নির্জ্জন পল্লীর পথে জয়ন্তর সুস্পষ্ট, শান্ত কণ্ঠস্বর যেন গানের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, অনুরণিত হতে লাগলো চতুর্দ্দিকে। গাড়োয়ানটা একবার কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখলো। গরুর গাড়ীতে চেপে ইংরিজী কবিতা আবৃত্তি করে, এমন আরোহী বোধ হয় তার অদৃষ্টে ইতিপূর্ব্বে জোটে নি।

—সুকুমার বললে, বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু অস্পষ্ট।

জয়ন্ত যেন রেগে উঠলো ; বললে, ভারি অন্যায়। আমি কত দূরে পড়ে আছি শুনেচ তো, তবু বাঙালা বই পেলেই দারিদ্র্যের ক্ষুধা নিয়ে তা

গ্রাস করে ফেলি। দুঃখের বিষয় ভাল বই সব সময় হাতের কাছে এসে পৌঁছয় না! কিন্তু সে কথা যাক, কাল সকালের ট্রেণেই আমরা কলকাতায় ফিরচি, খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা চাই, হোষ্টেলের অভ্যাস অনুযায়ী বেলা ন'টার সময় উঠলে চলবে না এবং বিছানার মধ্যেই যদি চায়ের পেয়ালা পৌঁছে দিতে না পারি তা হলে রাগ করো না।

—চায়ের প্রতি আপনার লোভও তো কারও চেয়ে কম দেখিনে।

—কিন্তু না পেলেও বেশ কাটিয়ে দিতে পারি। অভ্যাসগুলো আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়েচে। তুমি ছেলেমানুষ, এতটা আশা করিনে তোমার কাছে।

—ওঃ, আপনি যেন বিশ বছরের বড় আমার চেয়ে! বলবেন না, বলবেন না···

—না, তা বলবো না, কিন্তু একটা বয়স আছে জানো তো, যখন ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছুই পারা যায় না এবং আর একটা বয়স আছে যখন চেষ্টা করলে অনেক কিছুই আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়।

—আমার সে বয়স হয়নি, এই বলচেন তো? বেশ, বেশ। কিন্তু আর কতো দেরী বলুন তো?

—জায়গার নাম শুনেই বেরিয়ে পড়েচি, দূরত্বের হিসেব করিনি।

—এই কি প্রথম এলেন?

—ঠিক তাই।

সুকুমারের দুর্ভাবনা গেল বেড়ে! তবু এক সময় গরুর গাড়ীর চাকা গড়াতে গড়াতে ঢুকলো এসে ললিতাদের গাঁয়ে—গাড়োয়ানই খবরটা জানিয়ে দিলে। সুকুমারের এতক্ষণে আনন্দিত হ'বার কথা, কারণ, গাড়ীর ঝাঁকানি আর সহ্য করতে হবে না; কিন্তু হঠাৎ তার সঙ্কোচ হতে

লাগলো। সত্যি কোন প্রয়োজন ছিল না তার আসবার। গরীবের বাড়ী চড়াও হয়ে এ শুধু মিছিমিছি উৎপাত! কিন্তু কি করবে সুকুমার, জয়ন্ত যে তাকে না নিয়ে কলকাতা ছাড়তে চাইলো না, আর হঠাৎ এই লোকটার কথায় সে এমন সহজে রাজী হয়ে গেল যে এখন তার কোন হেতুই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!

গাড়ী এসে দাঁড়ালো পাশাপাশি কয়েকখানি মেটে ঘরের সামনে। মেটে ঘরের উপর টিনের চাল এবং টিনের চালের উপর আলকাৎরার রং ধরানো, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় সুকুমার সহজেই বুঝতে পারে। বাড়ীর সামনেটা একেবারে স্তব্ধ, দরজার সামনে একটা সজিনা গাছ, ডাল-পালা নিয়ে একেবারে নুয়ে পড়েচে। আশেপাশে আরও দু' একখানি বাড়ী, কিন্তু চোখ না থাকলে তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই কঠিন। এ বাড়ীর বাইরেটাও একেবারে চুপচাপ, তবে দরজার ফাঁক দিয়ে ম্লান একটু আলো এসে পড়েচে বাইরে; তাই থেকে বোঝা যায়, হয়তো একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় তা'রা এখানে।

গাড়ী থেকে নেমে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত চীৎকার সুরু করে দিল, ললিতা ঘুমুলি না কিরে? দরজা খোল্, দরজা খোল্…

দরজা খুললো। ললিতাই কালিপড়া একটা লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এসেচে বটে! কিন্তু দরজা খুলেই জয়ন্তর পাশে অপরিচিত একটী মানুষকে দেখে ললিতা একটু জড়সড় হয়ে পড়লো।

জয়ন্তই তাকে বাঁচালে।

—ভয় নেই, ইনিও তোর জয়ন্তদার দলে। লজ্জায় তোকে আছাড় খেতে হবে না উঠোনের মাঝখানে, আলোটা নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে চল্…

ছোট্ট উঠোনটুকু পার হতে কতক্ষণই বা সময় লাগে। এক পাশে

কৃষ্ণকলির সারি, তুলসীমঞ্চ, আর একপাশে ছোট্ট একটী পাতকূয়ো ; এইগুলো পার হয়ে গেলেই দালান, সেইটেতেই জয়ন্তর থাকবার ব্যবস্থা হয়েচে, ঘরে ঢুকতেই বোঝা গেল। ম্লান একটী লণ্ঠন জ্বলচে কোণের দিকে, ছোট্ট চৌকীর উপর কাপড়ের পাড় দিয়ে সেলাই করা বহুবর্ণের একটী চাদর, ছোট্ট একটী বালিশ—ফরসাই বলতে হবে।

ঘরে ঢুকেই জয়ন্ত বললে, একলা থাকিস নাকি এই বাড়ীতে ?

স্বল্প একটু হেসে ললিতা বললে, প্রায়। গোঁসাইদের গিন্নি রোজই সঙ্গে থাকেন, পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েচেন।

—খুব সজাগ প্রহরী বলতে হবে তা হ'লে !'—বলেই জয়ন্ত হোহো করে হেসে উঠলো। বসলো দু'জনে চৌকীটা দখল করে। তারপর জয়ন্ত বললে, খাবার বোধ হয় একজনের মতোই করে রেখেচিস, কেমন ? তা হোক, তোকে আর এত রাত্রে উনুন জ্বেলে রাঁধতে বসতে হবে না। যা আছে আমরা তাই ভাগ করে খাব।

ললিতা বললে, তাই আবার হয় নাকি ? আর আমি তো এখনও খাই নি ··

ললিতার সহজ, সরল আচরণ এতক্ষণ সুকুমারের বেশ লাগছিলো, কিন্তু এইবারে সে বিপন্ন বোধ করতে লাগলো ; করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বসলো, নিজের অংশটুকু আমায় বিলিয়ে দিয়ে আপনি নিজে শেষ পর্য্যন্ত উপবাস করবেন না কি ?

ললিতা হঠাৎ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো ; আপনি বলে তাকে হয় তো কেউ ইতিপূর্ব্বে সম্বোধন করে নি, তাই বিস্মিত হলো অনেকখানি। কিন্তু বিচলিত না হয়ে, জয়ন্তের দিকে চেয়ে সহজকণ্ঠে বললে, কলসীতে চিঁড়ে আছে জয়ন্তদা, আমার খাবার ভাবনা নেই

মোটের উপর এটুকু বোঝা গেল যে ললিতা তার সাধ্য অনুযায়ী অতিথিসৎকারের ত্রুটি রাখবে না। ললিতা অসাধারণ মেয়ে নয়, এটুকু গোড়াতেই বলে রাখা ভালো। রূপ তার অনেক, কিন্তু তার মধ্যে অসহ্য দাহ নেই, সহজ দীপ্তিতে সে রূপ অনায়াসে চোখের পাতায় স্নেহ-স্পর্শ দিয়ে যেতে পারে, এই পর্য্যন্ত। টানা টানা আশ্চর্য্য দুটী চোখ—দীঘির শান্ত জলের মতো এবং তারই মধ্যে প্রখর বুদ্ধির পবিচয়। আটপৌরে ময়লা একটী কাপড় তার পরণে, কিন্তু লণ্ঠনের অনতিপরিস্ফুট আলোয বেমানান মনে হয় না। মোটের উপর ললিতাকে দেখলে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নিজের গণ্ডী ললিতা ভাল করে চিনে নিযেচে; কোথায কতদূর এগিযে যাওয়া চলে, সেটা ও ভাল কবেই জানে।

আহারের আয়োজন অত্যন্ত সামান্য, অসামান্য যে হবে তা কেউ প্রত্যাশাও করে নি। ঢেঁকি-ছাঁটা রাঙা রাঙা চালের ভাত, গোটা দুই তরকারী, এক বাটী কবে ঘন দুধ—এই পর্য্যন্ত। জযন্ত প্রসন্নমুখে থালা প্রায় পরিষ্কার কবে ফেললে, কিন্তু সুকুমারকে দেখে মনে হলো, অসুবিধেব কাঁটা বিঁধছে তার গলায, অথচ সেটুকু এড়িয়ে যাবার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। ললিতাব অন্নে ও আজ অনাহূত হয়ে ভাগ বসিয়েচে, তার উপর তার সামান্য আয়োজনের ত্রুটি বিশ্লেষণ করে লজ্জা দেবার ধৃষ্টতা সুকুমারেব নেই। বারম্বার মনের মধ্যে এই কথাই সে উচ্চাবণ কবলো যে, জয়ন্তদার এ বড় অন্যায়। অকারণে একজনকে এমনি করে অপ্রস্তুত করবার কোন কারণই ছিল না।

আহার-পর্ব্ব শেষ হবার আগেই জয়ন্ত বললে, কাল সকালেই আমাদের যাত্রা। সুতরাং তোমার এই বাড়ীর চার্জ্জ আজ রাত্রিতেই

গোঁসাই-গিন্নীকে বুঝিয়ে দিয়ে যেও ললিতা। আর তোমার সেই কাকা? তাঁকেও একটা খবর দিয়ে যেতে হবে তো।

ললিতা কোন উত্তর দিল না।

কেন, খুড়ো ম'শাইটী তোমার গ্রামে নেই নাকি?

আছেন—

তবে?

তাঁকে খবর দেবার কোন দরকারই নেই জয়ন্তদা, খবর তিনি এমনিই পাবেন। এখন ডাকাডাকি করতে গেলে দরজাও বোধ হয় খোলা পাব না।

এই সামান্য কথার ভিতর দিয়েই বোঝা গেল ললিতার কাকাটীকে। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খুড়োটীর পেশা কি ললিতা?

জমিদারবাড়ী খাতা লেখেন।

ছেলেপুলে—পাঁচ ছ'টীর বেশী নিশ্চয়?

সাতটি ছেলে, একটি মেয়ে।

মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের কারণটা বোঝা গেল। কিন্তু আর না, তুমি গোঁসাইগিন্নিকে ঘুম থেকে তুলে তোমার বাড়ীর ব্যবস্থা এবং কাল সকালে যাবার আয়োজনটা সেরে ফেল। যে গরুর গাড়ীটা আমাদের গ্রামে পৌঁছে দিয়েচে, তাকে আমি সকালেই আসতে বলে দিয়েচি।

চুকলো আহারের পর্ব্ব, ললিতাই উচ্ছিষ্টগুলি তুলে নিয়ে, জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললো। তার পর শয়নের পালা। ছোট্ট চৌকী ভাগ করে নিলো দুজনে। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে ললিতা চলে গেল। লেপের বালাই নেই। দু'জনের গায়ের চাদর দুটোই লেপের অভাব পূরণ করলে।

পায়ের দিকের জানালাটা রইলো খোলা—তারই ফাঁকে দেখা যায় অস্পষ্ট কতকগুলো গাছপালা, তারকা-চিহ্নিত নিশীথাকাশের বিস্তীর্ণ, রহস্যময় রূপ !

জয়ন্ত বললে, এই আমাদের দেশ সুকুমার—রাত নটার পর যেখানে রাত দুপুর, ষোলয় পা দিলে মেয়েরা যেখানে অরক্ষণীয়া, সাতটী ছেলের জন্ম দিয়েও মানুষ এখানে নীতির ধ্বজা উড়িয়ে বেড়ায়। বার্ণার্ড শ' বহু সন্তানের জনক বলে টলষ্টয়কে গাল দিয়েচেন, আর আমাদের দেশে টলষ্টয় ঘরে ঘরে, কেবল টলষ্টয়ের শক্তি আর প্রতিভা বাদ দিযে !

জয়ন্ত একটা চুরুট ধরালো। সুকুমার রইলো একটু চুপ করে। ললিতা এতকাল এই সহানুভূতিশূন্য পরিবেষ্টনের মধ্যে কি করে বাস করে এলো, সুকুমার কিছুতেই যেন তা ভেবে উঠতে পারে না। কি নিয়ে কাটলো তার কৈশোর, কেমন করে গড়ে উঠলো তার এই দীর্ঘ ষোলটি বছর ? এমন কত মেয়েই যেন বেঁচে আছে, কেউ তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করে ? বোধ হয না ; অন্ততঃ, সুকুমার তো এখানে পৌছবার আগে ললিতা সম্বন্ধে ভাঁববার এতটুকু অবকাশ পায নি।

সুকুমার অনেকক্ষণ পরে শুধু বললে, ভারি ঘুম পাচ্চে জয়ন্তদা, আপনি ললিতার খুড়োকে গালাগালি দিন মনে মনে, আমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করি।

আর ললিতা ?

জয়ন্ত আর সুকুমারের ঘরে লণ্ঠনের আলো নিস্তেজ করে দিযে এসে ললিতা দাঁড়ালো তাদের ছোট্ট উঠানটীর সামনে। চাঁদ নিভে যাচ্চে, গাছের ছায়া নেমেচে উঠানের চারিদিকে। ঘাসে ঘাসে শিশির ঝরচে,

কৃষ্ণকলির পাতায় পাতায়। ললিতা তার বড় বড় দুই চোখ দিয়ে একবার বেশ ভালো করে দেখে নিল। কাল রাত্রিতে এতক্ষণে সে কলকাতায়। এ বাড়ীতে দুঃখ পেল সে অনেক, তবু নাড়ীর সঙ্গে যেন এর যোগ, সেই নাড়ীতে পড়েচে ছুরির টান—বিচ্ছেদ ঘটলো বলে। দেরী নেই, আর দেরী নেই।

ললিতা কতক্ষণ অসাড় মূর্ত্তির মত সেইখানটিতে দাঁড়িয়ে রইল, মিনিটের পর মিনিট সময়ের স্রোত চললো বয়ে। তার ষোল বছরের যৌবন নিয়ে ললিতা এই গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে সচকিত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। মানুষের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলবার উপায় পর্য্যন্ত তার ছিল না। এতদিনে সেই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটলো। এইবার তার যাত্রা সুরু হলো নতুন পথে, ভবিতব্যতার হাতে সে নিজেকে ছেড়ে দিলো। তবু বিদায় নেবার এই পূর্ব্বমুহূর্ত্তে চোখের জল তার হঠাৎ একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো কেন,—সে কথা কে বলবে ?

সকাল বেলা ছই-তোলা একখানি গরুর গাড়ী যখন দামোদরের দিকে এগিয়ে চললো, তখনও এ গাঁয়ের ঘুম ভাঙেনি। নির্ব্বাক ললিতা সেই কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের সকালে যখন মনে মনে এই গ্রামখানির কাছে বিদায় নিল, তখন তার দুই চোখ ভাসিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমেচে !

গাড়ী থামলো এসে কলকাতায়। ষ্টেশনের বিপুল জনতার দিকে চেয়ে ললিতার দুই চোখের দৃষ্টি যেন বন-হরিণীর মত ব্যাকুল এবং বিহ্বল হয়ে উঠলো। পল্লীগ্রামের সেই অনতিপ্রশস্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে যেন তার নিজস্ব একটি স্থান ছিল, ছিল একটু স্বাতন্ত্র্য ; কিন্তু প্রকাণ্ড ষ্টেশনের চতুর্দিকব্যাপী ব্যস্ততা এবং কোলাহল লক্ষ্য করে ললিতার মনে হলো, সে

যেন হারিয়ে যাবে, এখানে তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করবার অবসর পর্য্যন্ত কারও নেই! তবু, প্ল্যাটফর্ম্মে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো—হারিয়ে যাচ্চে তার পল্লী-পৃথিবী, চোখের সম্মুখে নূতনতর, বৃহত্তর পৃথিবীর এ কি বিপুল ইসারা!

ললিতা মনে মনে কাঁপতে লাগলো।

জনারণ্য ভেদ করে ট্যাক্সি ছুটে চললো বালিগঞ্জের দিকে। ললিতার মুগ্ধ, বিস্মিত, বিস্ফারিত দুই চোখ যেন পথপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রহস্যকে নিঃশেষে পান করতে লাগলো। কলকাতার স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেচে; কলকাতা বলতে ললিতা জানতো, ট্রাম, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর চিড়িয়াখানা! কিন্তু এ কলকাতার সঙ্গে তার মিল নেই। পথের মোড়গুলিতে মানুষ ও মোটরের মেলা, দুধারের বাড়ীগুলি এত বড় বড় যে চোখ চেয়ে উপরের দিকে চাইতে ভয় হয়!

গাড়ী এসে পড়লো দক্ষিণাবাবুর বাড়ীর দরজায়। ছুটে এল লীলা আর কেতকী, দক্ষিণাবাবু পর্য্যন্ত বালাপোশখানা গায়ে দিয়ে নেমে এলেন।

মেয়েরা এত অনায়াসে নিজেদের আপনার করে নিতে পারে যে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। লীলা আর কেতকী দুই বন্ধু মিলে ললিতাকে সোজা উপরে টেনে নিয়ে গেল এবং তার পরমুহূর্ত্তেই খিল পড়লো কেতকীর ঘরে।

ললিতা যে কি কথার কি উত্তর দেবে ভেবে ঠিক করতে পারে না!

ললিতা কতদূর পড়েচে, পাড়াগাঁয়ের সেই নির্জ্জন বাড়ীতে সে একা থাকতো কি করে, ফাঁকা বাড়ীতে তার কি এতটুকু ভয় হতো না, এখানে কোন অসুবিধে হলে ললিতা যেন তখনই কেতকীকে জানায়, এখন কি করবে ললিতা—পড়বে না মনের মতো একটী বর বেছে নিয়ে

চম্পট দেবে, ক'টা জামার মাপ তার কালই দেওয়া দরকার, ললিতার ঘর ঠিক হয়েচে একেবারে কেতকীর ঘরের পাশে, বলো তো দুজনে এক ঘরেই শোব এখন—এমনি অজস্র প্রশ্নে ও সংবাদে দুই জনে ললিতাকে বিহ্বল, বিপর্য্যস্ত করে তুললো।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হলো যে লীলা আর ললিতা এক ঘরেই শোবে। বড়দিনের ছুটী ফুরোবার পর লীলা ফিরবে হোষ্টেলে, তার পর ললিতা অনায়াসে কেতকীর ঘরে শুতে পারবে।

পরিচয়ের প্রথম পর্ব্ব শেষ হবার পর ললিতা সহজ করে দুই একটী কথা বলতে পারলো।

—আপনি বুঝি এখানে থাকেন না লীলা-দি?

—না ভাই; এখানে আমার থাকা সম্বন্ধে তোমার কেতকী-দির ভয়ানক আপত্তি আছে।

কেতকী কৌতূহলী কণ্ঠে শুধাল: কেন শুনি মশাই?

—শুনবে? তোমার কেতকী-দি সমবয়সী মেয়েদের ভয়ানক ভয় করেন। কারণটা দু' একদিন এখানে থাকলেই বুঝতে পারবে।

কেতকী বললে, মুখের সামনে এরকম নিন্দে ভয়ানক খারাপ। আমি আপত্তি করচি।

—তা' করো। কিন্তু পীঠের আড়ালে এরকম নিন্দে আরও খারাপ। আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই নে। সুকুমারবাবু বড়লোকের ঘরের একমাত্র ছেলে, তার ওপর দুজনে দুজনের প্রেমে পাগল, এর মাঝখানে আর কেউ এসে উৎপাত ঘটায় এ কি সত্যিই ভালো? তুমিই বল তো ললিতা?

ললিতা মুখ নিচু করে বললে, এঁদের বিয়ের কথা হচ্চে বুঝি লীলাদি?

লীলা বললে, এখন পূর্ব্বরাগের পালা—তুই তার মানে বুঝবি না। বিয়ের কথা এখনও শোনা যায় নি, কিন্তু ওটা যে হবেই এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কেতকী বললে, তোর বিশ্বাস তোরই থাক। আমরা এমন ঠুনকো জিনিসের কারবার করি নে যে অপর কারও হাত ঠেকলেই তা ভেঙে যাবে বলে ভয়ে অস্থির হব।...কিন্তু ছোট বোনের সামনে কি যা-তা বলা হচ্চে শুনি?

কথাটা একটু হালকা করে আনবার জন্যে লীলা বললে, চোদ্দ পার হলেই সব মেয়ের বয়স সমান। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থেক না কেতকী-দি; যে চোখটা কাণা তীর হয়তো সেই দিক থেকেই আসতে পারে।

কেতকী বললে, এখন থেকে মনে রাখবো। কিন্তু নিজেব খববটা বলো তো শুনি? জয়ন্তদা তোমায় তো এখানে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হোষ্টেল ছেড়ে আসতে বুক যে ফেটে গেল। বলবো নাকি সে কথা ললিতাকে?

লীলা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, বলবাব কিছু থাকলে তবে তো? ললিতার দিদি একেবারে খোলা খাতা; যাকে ইংরিজীতে বলে 'Sphinx without secret'। এমন কাজ সে কিছুতেই কববে না যে তার জের টানবার জন্যে তাকে সারা জীবন পুরুষের সংসার খরচের হিসেব রাখতে হবে।

কেতকী হাসতে হাসতে বললে, বিয়ে কথাটার খুব সরল মানে করে নিয়েছিস দেখছি!

লীলা বললে, সরল এবং সত্যি। তিনি মাসান্তে টাকা এনে দেবেন

আর সেই টাকায় হিসেব করে সংসার চালাতে হবে আমাকে। সে আমি পারবো না ভাই। কুড়ি বছর ধরে ভালবাসা ভাল, কিন্তু কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবন—হরিবল্!

কেতকী কিন্তু লীলার কথায় সায় দিতে পারলে না। খোঁচাটা লেগেচে তাকেই বেশী করে। সুতরাং তর্ক সুরু হয়ে গেল দুই বন্ধুর মধ্যে।

—তুমি কি মনে করো যে স্বামীর সংসাব খরচের হিসেব রাখা ছাড়া স্ত্রীর আর কোন কাজ নেই?

—হয় তো আছে, কিন্তু গোড়ার কথাটা তাই। স্বামী রাত বারটার পর ক্লাব থেকে ব্রীজ খেলে ফিরবেন, খাবার ঠাণ্ডা হযে গেলে চলবে না; সকালে অফিস যাবেন, জামা কাপড় ঠিক করে রাখতে হবে—ধোবার বাড়ী থেকে কাপড়-চাদর যথাসময়ে আনিয়ে দিতে হবে; ছেলেপিলে যাবে স্কুলে, তাদের কোন্ প্যাণ্টের বোতাম নেই, বোতাম দিতে হবে বসিয়ে · এর মাঝখানে প্রেমের স্বপ্ন দেখবো কখন বলো তো?

—প্রেম তখন স্বপ্ন থাকবে না, বাস্তবে এসে পৌছবে।

—সেই বাস্তবটাই তো সংসারের হিসেব, স্বামী এবং ছেলেপিলের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার নানারকম আয়োজন। প্রেমের অপমৃত্যু তো সেইখানে।

—অর্থাৎ প্রেম হবে এমন যে রবিঠাকুরের ভাষায—'ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়', এই তো?

—কতকটা তাই। অর্থাৎ এমন লোক যদি পাই, যিনি আমায় দেবীর মতন ভক্তি করবেন না কোনদিন, যাঁর কাছে আমি চির-কিশোরী হয়ে থাকবো; যিনি প্রয়োজন না হলেও ঝগড়া করতে পারবেন এবং ঝগড়া শেষ হবার পরেই ঠাকুরলাল হীরালালের বাড়ী ফোন করে নতুন একটা

প্রেজেণ্ট পাঠাবার হুকুম দেবেন ; যিনি হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় পটু, অথচ, আমার চোখের দিকে চেয়ে যাঁর মুখ দিয়ে বাক্য-নিঃসরণ হবে না ; আমার মধ্যে যে সব গুণ কোনদিনই নেই, তারই প্রশংসায় সময় অসময় যিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন এবং আমার জীবনে যদি 'man of third floor back'এর আবির্ভাব হয় তা হলে সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে তিনি আমায় সমান ভালবেসে যাবেন।

ঠাট্টার সুরে কথাগুলি বলতে বলতে লীলার চোখমুখ কৌতুকে, হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং বক্তৃতা শেষ করে হাসির ঢেউ তুলে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়তে তার দেরী হলো না।

কেতকী বললে, বাজে কথায় ভোলবার মেয়ে আমি নই কেতকী। তোমার গলদ কোথায় সে একদিন আমি খুঁজে বার করবোই।

তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে লীলা বললে: তোর চ্যালেঞ্জ আমি য়্যাক্‌সেপ্ট্ করলাম। কিন্তু পারবি নে তুই, এ বড় শক্ত জায়গা।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুললো। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনজনে চললো বাগানের দিকে। ক্রিসান্থিমাম থেকে ম্যাগনোলিয়া, জিবানিযাম থেকে য়্যামোরাস লিলি···সবুজ ঘাসের কোলে কোলে চারিদিক আলো করে রেখেচে। অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্যে মাথার উপর চাঁদ, ঝাউগাছগুলি বাতাসে মর্ম্মরিত। কেতকী গুণ গুণ করে গান ধরেচে—'ওগো সুন্দর দেবতা'···মিষ্টি গলার সুরে চারিদিকে যেন ইন্দ্রজাল রচিত হচ্চে, গানের ভাষা যেন তার গোপন স্বপ্নের বাহন ; সুর উৎসারিত হচ্চে তার আত্মার কোন নির্জ্জন উৎস থেকে। ঘুরতে ঘুরতে বসলো সবাই একটা বেঞ্চ দখল করে।

কেতকীর দিকে চেয়ে লীলা বললে, তোর মতো গান গাইবার কি কম

চেষ্টা করেচি ভাই, কিন্তু এ গলা দিয়ে সুর আর বা'র হোলো না। সেই থেকে সুরু করেচি, অসুর চর্চ্চা।

অসুরটী কি শুনি? কেতকী জিজ্ঞাসা করলো।

কবিতা।—ভয় নেই তোর, লিখি না, পড়ি আর আবৃত্তি করি। তোর যেমন মনের অবস্থা যখন হয় খুব ভাল, কিম্বা খুব খারাপ, তখন গান আর কোন বাধা মানে না; আমি তেমন তেমন অবস্থায় চীৎকার সুরু করে দিই কবিতার বই নিয়ে। শুনবি একটা? একেবারে লেটেষ্ট—

> এতদিনে মনে হলো, তোমাকেও ভালবাসা যায়!
> প্রচণ্ড পিপাসা নিয়ে এসেছিলে হৃদয়ের দ্বারে,—
> ক্ষণজীবী বন্ধুত্বের উন্মত্ত পিপাসা!
> সেই ভেবে প্রেম মোর মনে মনে মরিছে লজ্জায়!
> অন্ধ হয়ে গেল চোখ কঠিন আঘাতে,
> তোমার মুখেতে আর পারি না তাকাতে;
> ঘৃণা করে দূরে থাকি; তবু মন নিকটে তোমার!

এমনি করে চললো দুই বন্ধুর গান আর কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। রাত্রি গাঢ় হয়ে এল; চারিদিক হয়ে এল নিস্তব্ধ! আর সেই স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে, চারিদিকের ফুল আর ফুল-গন্ধের মধ্যে ললিতার দুই চোখ যেন হঠাৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মনে হল, সে যেন জেগে ঘুমুতে আরম্ভ করেচে! এ যেন তার এতকালের পরিচিত পৃথিবী নয়, এখানকার মানুষগুলি আলাদা, মানুষের ভাষা আলাদা, রীতি আলাদা, ব্যবহার আলাদা! চারিদিকে গভীর উদ্বেগহীনতা, কি মধুর মন্থরতা! এ বাড়ীর মেয়েদের মুখে শুধু প্রেমের গল্প, প্রেমের গান এবং প্রেমের কবিতা!

প্রতিদিনের জীবন যাত্রার উপর অভাবের ছাপ পড়ে না এখানে ; প্রতি-দিনের মধ্যে নেই প্রতিদিনের তুচ্ছতা—যেন গল্পের বইয়ের এক একটী পরিচ্ছেদ এবং সেই পরিচ্ছেদগুলির প্রত্যেকটী পাতায় শুধু নূতন আনন্দ আর মিষ্টি স্বপ্ন ! নাম-না-জানা বিচিত্র ফুলগুলির গন্ধ যেন ললিতার সমস্ত চেতনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল, নিয়ে গেল তাকে কোন্ নিরুদ্দেশ কল্পনার দেশে !

পরদিন বিকেল পাঁচটা না বাজতেই এল সুকুমার। দক্ষিণাবাবু ড্রয়িং-রুমে বসে প্রাচীন ভারতের ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা বই পড়বার চেষ্টা কবছিলেন। সুকুমার ঘরে ঢুকতেই দক্ষিণাবাবু বইখানি বন্ধ করে বললেন, তারপর, ললিতা সম্বন্ধে তোমরা কি ঠিক করলে বলো তো ?

সুকুমার রীতিমত বিব্রত বোধ করলো। একে তো বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মেযেদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে তার বাধে, তার উপর ললিতা সম্বন্ধে সে কিছুই ভাবে নি, ভাববার কথাও তার নয়। তবু যা হয উত্তব একটা দেওয়া প্রয়োজন। তাই একটু চুপ করে থেকে সুকুমার বললো : ললিতা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে সে সম্বন্ধে জযন্তদা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলছিলেন।

দক্ষিণাবাবু এতেই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। নানাবিধ গুরুতর সমস্যার সমাধানে এখনও তাঁর মতামতের মূল্য আছে, এ কথা মনে করতে পারলে তিনি উৎসাহিত বোধ করেন। বললেন : বেশ, বেশ, জয়ন্ত কি বেড়াতে গেল না কি ? ডাকো না একবার, কিছুক্ষণ আলোচনাই করা যাক।

সুতরাং ডাক পড়লো জয়ন্তকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতের অপরাহ্নে,

ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আলোচনা উঠলো জমে ; মধ্যে মধ্যে আসতে লাগলো চা, গরম ডালমুট এবং মটরশুঁটির কচুরী প্রভৃতি খাদ্য এবং পানীয়।

কথাটা ললিতাকে নিয়েই সুরু হোল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ালো সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে দুরূহ তত্ত্বালোচনায়।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তুমি যে ললিতাকে কোন আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করোনি, এতে আমি ভারি খুসী হয়েচি জয়ন্ত। নিজের মেয়েটাকে তো লেখাপড়া শিখিয়ে অনেকখানি দূর করে ফেলেচি, ললিতা কাছে থাকলে, ভাবছিলুম এই অকর্ম্মণ্য শরীরটার ভার তার হাতেই ছেড়ে দেব।

জয়ন্ত বললে, তা আপনি দিন, সে সম্বন্ধে আমার অনুযোগের কোন কারণ নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা সংসার থেকে দূরে গিয়ে পড়ে, এ কথা যদি বলেন, আমি তার প্রতিবাদ করবো।

আলোচনা ঘোরাল হয়ে উঠচে বুঝতে পেরে দক্ষিণাবাবু চাকরটাকে ডেকে গড়গড়াটা আনবার হুকুম দিলেন। তারপর জয়ন্তর কথাব জের টেনে বললেন, তা করো। কিন্তু অভিযোগটা আমার লেখাপড়া শেখার বিরুদ্ধে নয় হে। সামাজিক প্রয়োজনে আমাদের মেয়েরা আজ এত উৎসাহ করে লেখাপড়া শিখচে, এ কথা বোধ হয় তুমিও স্বীকার করবে। কিন্তু এই সামাজিক প্রযোজন লেখাপড়া শেখবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি, এটাও মনে রেখো। এর জন্য আরও কয়েকটা ছোটখাট বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় ; তোমরা এগুলোর নাম দিয়েচো সহজ ভদ্রতা। যেমন, পার্টিতে এটেণ্ড করা, সিনেমা, থিয়েটার···

সুকুমার রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠে পড়বার উপক্রম করছিলো। দক্ষিণাবাবু বললেন, অভিযোগটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত নয়

সুকুমার, সুতরাং তুমি বিব্রত হযো না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চেয়েছিলাম যে বাড়ীর ভিতরের চেয়ে, বাড়ীর বাইরের প্রযোজন যেন অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং, আমাদের মত যারা শেষ কটা দিন বিশ্রাম ও সেবা পাবার লোভে নোঙর করেচে, মনে মনে তাদেব একটু দুঃখ থাকবারই কথা। কাবণ মেয়েরা আর সময় পাচ্চে না স্বামীর সেবা করবাব, বুড়ো বাপকে ভালবাসবাব।

কথা বলতে বলতে দক্ষিণাবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন গভীর, আর্দ্র হযে এলো। মনে হলো তাঁর এই পরিণত বয়সের জীবন যাত্রাব মধ্যে কোথাও যেন অনুচ্চারিত একটি বেদনা সংগোপনে সঞ্চিত হচ্চে।

এরপর আলোচনা যেন স্তিমিত হয়ে আসছিল, ঘবেব অস্পষ্ট অন্ধকারটাও যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল, দক্ষিণাবাবু গলাটা পবিষ্কাব করে হাঁক দিলেন : হরিচরণ, বাড়ীর আলোগুলো, সন্ধ্যেবেলা জ্বেলে দিযে যা বাবা—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। এখন আর ড্রয়িংরুমটা পূর্ব্বেব মত মুখ ভার করে নেই। এর সোফায়, পুরু গালচেয়, বড় আয়নাখানায় প্রখর বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল করচে। যাবা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই ঘরখানির মধ্যে বসে অত্যন্ত দুরূহ সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল, তাদের মুখগুলিও যেন খুসীতে ছেয়ে গেছে। সত্যি, অন্ধকার যে একলার জন্য এ কথা এতক্ষণে বোঝা গেল। আলোচনার মোড় কোন্‌দিকে ফেরান যায় দক্ষিণাবাবু বসে বসে সেই কথাই বোধ হয় ভাবছিলেন; হঠাৎ ঘরে ঢুকলো কেতকী আব লীলা; তাদের হাইহিল জুতো থেকে, কাণের ওরিয়েণ্টাল কাণবালা পর্য্যন্ত আলোয় এবং উল্লাসে ঝলমল করচে। পিছনে পিছনে এল ললিতা। ইতিমধ্যে ললিতার

আকৃতিগত যে পরিবর্ত্তন ঘটেচে তাও সবিশেষ লক্ষ্য কববাব ; যদিও হাই-হিল জুতো ওব ছোট্ট পা দুটীতে উৎক্ষিপ্ত করেনি, তবুও পবিবর্ত্তন ঘটেচে অনেক, অনেক। যে মেযে ষোল বছব বযসেব পূর্ব্বে কোনদিন সেমিস্ পবেনি, এখন তাকে কলকাতার মেযে বলে চালিযে দেওযা খুব বেশী কঠিন নয। এমন কি, কাপড় পবাব ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত লীলাব কাছ ঘেঁষে গেছে।

কেতকী ঘবে ঢুকেই দক্ষিণাবাবুব চেযাবটাব পিছনে এসে দাঁড়াল। তাবপব তাঁব কাণেব কাছে ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে : আমবা সিনেমায যাচ্চি বাবা, ললিতাকে নিযে ; বেচাবী কোনদিন এ সব দেখেনি। তাব কণ্ঠে সহানুভূতিব বদলে, কতকটা অনুকম্পাব ভাব !

দক্ষিণাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, নইলে, তোমাব মোটেই ইচ্ছে ছিল না, এই তো ?

কেতকী একটু অপ্রস্তুত হযে বললে ঠিক তাও নয, নিজেবও একটু ইচ্ছে ছিল। কদিন বাড়ীতে বসে বসে কি বিশ্রীই লাগছে বাবা !

দক্ষিণাবাবু কেতকীব কথাব কোন উত্তব দিলেন না। কি যেন ভাব-ছিলেন তিনি মনে মনে। বোধ কবি তিনি স্থিব কবে বেখেছিলেন, সুকুমাবকে উপবে নিযে গিযে কেতকী বুঝি গান শোনাতে বসবে। কিন্তু সে বকম কিছুই ঘটলো না। না, মেযেকে তিনি এতদিনেও বুঝতে পারলেন না। তাঁদেব যৌবন-দিনে নাবী-হৃদযেব গতিবিধি নির্ণয কবা যেন এব চেযে অনেক সহজ ছিল। সুকুমাব নিশ্চয অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবে মনে কবে তিনিও ক্ষুব্ধ হযে উঠতে লাগলেন।

এমন সময গাড়ী বাবান্দাব নিচে শব্দাযমান একখানা মোটব এসে দাঁড়াল। সুকুমাব উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বাইবে নিক্ষেপ কবতেই দেখলো, হ্যাঁ, মিত্তিবদেব সেই ছেলেটিই বটে। সুধাংশু মিত্র। পদশব্দে পাবিপার্শ্বিক

পৃথিবীকে সচকিত করে ঘরে এসে ঢুকলো সুধাংশু মিত্র। চেয়ে দেখবার মতো চেহারা—যাকে সুপুরুষ বলে আর কি। দামী দিশি ধুতির অবলুণ্ঠিত অগ্রভাগ বাঁ হাতে একটু তুলে ধরে দাঁড়ালো এসে একেবারে দক্ষিণাবাবু আর কেতকীর সামনে। প্রণাম করলে এমন ভঙ্গিমায় যে ও যেন শুধু ওকেই মানায়। সৌজন্য এবং মর্য্যাদাবোধ কথা দুটি যেন একা ওরই জন্য প্রচলিত হয়েচে!

দক্ষিণাবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—এস, এস, কোথায় ছিলে এতদিন বলো তো? বৌদ্ধ-জাতকের ইংরিজী অনুবাদখানা এনে দেবে বলে সেই যে গেলে তারপর—

সুধাংশু একটু লজ্জিত বোধ করলো। কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত হওয়া বলে না। হাতেই ছিল তার বইখানা। সেটা তখুনি পৌঁছল দক্ষিণাবাবুর হাতে। তারপর বললে, হঠাৎ কার্সিয়াং চলে যেতে হয়েছিল বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। এমন সুযোগ যখন প্রায়ই মেলে না, তখন সময়টা পৌষ মাস হলেও, যাত্রাটা স্থগিত রাখতে পারলুম না।

দক্ষিণাবাবু বললেন, রাখা উচিতও হোত না। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন? বসো, বসো—

বসবার পূর্ব্বে সুধাংশু একবার ঘরের চতুস্পার্শে ভাল করে চেয়ে দেখলো, অর্থাৎ দেখলো কেতকীকে আর লীলাকে, ললিতা আর জয়ন্তকে। শেষের দুজনের দিকে চেয়ে বললে: এঁদের তো চিনতে পারলাম না দক্ষিণাবাবু—

কেতকী বললে, এঁরা নবাগত। লীলার দাদা আর পিসতুতো বোন।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সুধাংশু মিত্র বসতে পারলো। কিন্তু বসেই কি স্বস্তি আছে! সুকুমারকে এখনও কুশল-প্রশ্ন করা হয় নি, না লীলাকে,

না কেতকীকে। সুকুমারকে নিঃশব্দে একটা নমস্কার জানিয়ে সুধাংশু লীলার দিকে ফিরে চাইলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা নিশ্চয় কোন এন্‌গেজমেণ্ট্ রাখতে যাচ্ছিলেন, আমি বোধ হয় ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে বাধা দিলাম।

লীলা ঘাড় নেড়ে বললে, আমরা সিনেমায় যাব ভাবছিলাম, কিন্তু সে আজ নাই বা হোল, আর একদিন যাব আমরা—

কেতকীর কিন্তু ভাল লাগলো না প্রস্তাবটা। তার ওরিয়েণ্টাল কাণ-বালার ঘন আন্দোলনে স্পষ্ট বোঝা গেল যে এ বিষয়ে তার আপত্তি আছে। সুধাংশু সেটুকু লক্ষ্য করলো। তারপর কেতকীর দিকে চেয়ে বললো, আপনি ঠিকই বলেচেন। একবার কোথাও যাব স্থিব করলে, আমি বাড়ী বসে থাকতে পারি না। চলুন না, সকলে মিলে যাওয়া যাক?

কেতকী কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারছিলো না। এমন সময় দ্বাবের কাছে আর একটি লোকের ছায়া পড়লো। ছোটখাট লোকটী, মধ্যাঙ্গ মেদবহুল, যদিও বয়স খুব বেশী নয়। মাথার পিছনেব দিকে চুলগুলি বড় বড়, সামনে দিকে টাক পড়তে সুরু হয়েচে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, সৌখীন বালাপোশ কাঁধের ওপরে। গায়ের রং বেশ ফর্সা বলে নিতান্ত বেমানান হয নি।

লোকটী ঘরে ঢুকতেই কেতকী আনন্দে করতালি দিযে উঠলো!

—এই যে অনুপবাবু, আসুন! আপনি এলেন, আমার আর সিনেমায় না গেলেও চলবে।

অনুপম ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার জানাল। দক্ষিণাবাবু প্রতি-নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন এবং যাবার সময় ললিতার কাছে এসে

বললেন, চলো তো মা, উপরে গিয়ে তোমাতে আমাতে একটু গল্প-গুজব করি।

এই স্বল্পপরিচিত এবং অতি পরিচিতদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ললিতার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছিল। দক্ষিণাবাবুর কথা শুনে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু কেতকী তাকে ছাড়লে না। দক্ষিণাবাবুর দিকে চেয়ে বললে, ওকে নিয়ে গেলে আমাদের চলবে না বাবা। ওকে আজ সমস্তদিন ধরে কফি তৈরী করতে শিখিয়েচি, আমাদের সকলকে কফি খাওয়াবার ভার আজ ওর ওপর।

অগত্যা দক্ষিণাবাবু একাই উঠে গেলেন উপরে। শেষ পর্য্যন্ত সিনেমা যাওয়াটাও স্থগিত হলো, অর্থাৎ গল্পে এবং আলাপে আসর উঠলো জমে।

লীলা জয়ন্তর সঙ্গে সুধাংশু আর অনুপমের পরিচয় করিয়ে দিলে। সৌজন্য থেকে আলাপ ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতার দিকে গড়াতে লাগলো।

কেতকী জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললে, অনুপমবাবু মস্ত বড় কবি এ খবরটা আপনাকে দেওয়া হয়নি জয়ন্তদা! কিন্তু কবি বলে ঠাট্টা করা চলবে না আপনার। এদিক দিয়ে ইনি একেবারে আপনার দলে।

অর্থাৎ?—জয়ন্ত প্রশ্ন করলো।

অর্থাৎ খালি কল্পনা নিয়ে কারবার এঁর নয়, এঁর পা থাকে মাটীতে এবং চোখ থাকে আকাশে। সেদিন কে একজন বলছিল, অনুপমবাবুকে সে মুচিপাড়ায় একটা ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করতে দেখেচে।

অনুপম একটুও বিচলিত হলো না, কিন্তু বাকী সবাই কথাটাকে পরিহাসচ্ছলে গ্রহণ করে হাসলো একটু। জয়ন্ত বললে, অর্থাৎ আপনি ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। হরিজন-সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা আপনার উচিত ছিল, কিন্তু আপনি লেখেন কবিতা। আপনার সঙ্গে আমার মিল এই

পর্য্যন্ত যে আমার হয়তো অনেক কিছুই লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে আমার উপর পড়েচে বক্তৃতা দেবার ভার।

আবার হাসির গুঞ্জন উঠলো ঘরের মধ্যে। তারপর এলো কফির পেয়ালা, ললিতার হাতের তৈরী। একটু আধটু চুমুক দিতে দিতে তারিফ করলো কেউ কেউ ললিতার গুণপণার, এবং কফির পেয়ালা নিঃশেষ হবার পূর্ব্বেই ললিতার প্রসঙ্গ চাপা পড়লো। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনুপম হয়তো লক্ষ্য করছিল তাকে, সুধাংশু হয়তো সৌজন্যের খাতিরে মাত্র আধ চামচ চিনি নিয়ে ললিতাকে অনুগৃহীত করেছিল, কিন্তু এই ড্রয়িংরুমের আবহাওয়ার মধ্যে সে যে অনেকখানি অবান্তর এটুকু উপলব্ধি করতে তার বিলম্ব হয়নি। নিঃশব্দেই সে চলে আসছিল, কিন্তু লীলার দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারলো না। উঠে এসে লীলা বললে, যাওয়া তোমার এখন হবে না ভাই, বসতে হবে আমাদের কাছে।

সুতরাং ললিতা এসে বসলো তাদের মাঝখানে। কিন্তু এর চেয়ে তার যাওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধতে লাগলো তার সর্ব্বাঙ্গে. এদের চটুল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে নিজেকে সে কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারলো না। নিজের উপর ললিতা ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, বাঁচাল তাকে অনুপম হালদার। বসে থাকতে থাকতে অনুপমের দুটী চোখ যেন স্তিমিত হয়ে এসেছিল, হঠাৎ চোখ চেয়ে বললে, কথার জাবর কাটতে কাটতে বিরক্তি ধরে গেচে কেতকী দেবী, এবার একটু সঙ্গীত-সুধা পরিবেশন করুন।

ললিতা মনে মনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এ তবু অনেক ভালো!

কিন্তু কেতকী তখনই রাজী হোল না। বললে, গান যদি নিতান্তই গাইতে হয় তার জন্যে আমার চেয়ে যোগ্য লোক রয়েচেন।

ললিতা কটাক্ষ করলে লীলার দিকে। লীলা উঠলো রেগে। বললে : গান জানি না বলে ঠাট্টা দেখেচেন? আমিও কাল থেকে রেডিয়োর লেস্‌ন্‌গুলো অভ্যেস করচি, দেখো তখন।

লীলার রাগটা অবশ্য কৃত্রিম। আলাপের নিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হলো না এতটুকু। কেতকী বসলো গিয়ে মিউজিক টুলে। পিয়ানোর ডালাটা খুলে, মখমলের চটি-মোড়া পা রাখলো নিচের দিকে, তারপর সুধাংশুর দিকে চেয়ে বললে, কি গাইব বলুন তো সুধাংশুবাবু?

সুধাংশু বললে, এ সম্বন্ধে আমি লীলাদেবীর মত আনাড়ী। গান গাইলে তার রসটুকু গ্রহণ করি ষোল আনা, কিন্তু এক আনাও তার ফিরিয়ে দিতে পারি না। তার চেয়ে অনুপমবাবুর সাজেশানই বোধ হয় এক্ষেত্রে ভাল হবে।

অনুপম বললে : ফরমাস দিয়ে গান গাওয়াবার আমি ঘোরতর বিরোধী। যে গান আজ ওঁর সব প্রথম মনে আসবে, সেই আজকের সব চেয়ে ভালো গান।

কিন্তু কেতকী নিজের পছন্দমত গাইতে রাজী নয়। তাই জয়ন্ত প্রস্তাব করলে, সুকুমারের এই বিষয়ে কেতকীকে সাহায্য করা উচিত।

সুকুমার একা একটী সোফা দখল করে সেই গোড়া থেকে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে চলেছিল—যেন এ ছাড়া তার উপস্থিতির অন্য কোন সার্থকতা নেই। এখন জয়ন্তর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে মুখ তুলে চাইলো উপস্থিত সকলের দিকে। বললে : এ বিষয়ে আমি শুধু অনভিজ্ঞ নয়, অবান্তর।

সুতরাং আমায় আর ওর মধ্যে টানবেন না জয়ন্তদা। আমি এক পাশে বেশ আছি।

—আমরাও খুব খারাপ নেই সুকুমার। কিন্তু গান ও কবিতা সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ আর আসক্তি দুই-ই খুব প্রবল, এই কথাই তো কেতকীর কাছে এই কয়দিন ধরে শুনে আসচি।

সুধাংশু একবার সুকুমারকে দেখলো, তারপর পিয়ানোর উদ্দেশে দৃষ্টিপাত করে দেখলো কেতকীর চোখমুখ কৌতুক আর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চে। ছায়া পড়লো সুধাংশুর মুখে। সোফাটা টেনে এনে বসলো একেবারে লীলার পাশে। অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলে: সুকুমারবাবু কেতকী দেবীর প্রতি হঠাৎ এত অপ্রসন্ন হলেন কেন? Anything wrong with them?

লীলা বললে, না, বরং···

সুধাংশু ব্যঙ্গকণ্ঠে বললে, ও, তাই বলুন! কবির ভাষায় যাকে বলে —'একি প্রণয়েরি ধরণ?'

সঙ্গীত-সুধা পরিবেশনের প্রস্তাবটা যে হঠাৎ এতখানি তিক্ত হয়ে উঠবে, এ কথা অনুপম কল্পনা করতে পারে নি। ব্যাপারটার মোড় ফেরাবার জন্য অনুপম বললে, কেতকী দেবীর গান পরে হবে। একটা নতুন কবিতা লিখেছিলাম, শুনুন সকলে। কিন্তু কবিতার আগে একটু ভূমিকা আছে, সেটুকু ভুললে চলবে না, ইতিহাসও বলতে পারেন।

জয়ন্ত বললে, ঐতিহাসিক কবিতা নয়তো অনুপমবাবু?

অনুপম নিরস্ত হোল না; বললে: প্রত্যেক কবিতাই ঐতিহাসিক, এ কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে জয়ন্তবাবু। তার একটা না একটা ইতিহাস আছেই—বাইরের দিক থেকেই হোক আর

অন্তরের দিক দিয়েই হোক। কিন্তু বড় বড় কথা থাক—আগে কবিতাটাই শুনুন।

পকেট থেকে অনুপম বা'র করলো চামড়া-বাঁধাই পুরু একখানা খাতা। পাতা উল্টে চলেচে কবিতাটির সংস্থান নির্ণয়ের জন্য, এমন সময় পিয়ানোর শব্দে ঘর উঠলো অনুরণিত হয়ে।

কেতকী অনুপমের দিকে চেয়ে হাসলে একটু দুষ্টুমীর হাসি, তারপর বললে—'এও আপনারই অনুরোধ।'

অনুপমের খাতাখানি আবার পকেটজাত হোলো।

সুরু হোলো কেতকীর গান এবং কয়েকটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই প্রশস্ত ঘরের মধ্যে তার কণ্ঠের সুর-মূর্চ্ছনা যেন রেশমের মত কোমল পক্ষ বিস্তার করে সকলের দৃষ্টিতে এনে দিল স্বপ্নের আবেশ! হঠাৎ যেন এই ঘরের অস্তিত্বে মস্ত বড় পরিবর্ত্তন ঘটে গেচে। এতক্ষণ যারা এই ঘরের সোফা-সেটী দখল করে অত্যন্ত তুচ্ছ কতকগুলি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তারাও যেন ইতিমধ্যে নিজেদের খুঁজে পেয়েচে। সুধাংশু মিত্র লীলার কাছ ঘেঁষে বসে এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তার কাণে কাণে কথা বলে চলেচে যে তারা প্রেমে পড়েচে বলে ভুল হওয়া অন্যায় নয়। জয়ন্ত সস্নেহে সুকুমারের কাঁধের উপর একটী হাত রেখে লক্ষ্য করচে তার দৃষ্টির দুরাবগাহ ভঙ্গী। সত্যি, সুকুমার যেন মাটীর পৃথিবীতে পা দিয়ে বসে নেই। এতক্ষণ তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের ভাব, মুখের রেখাগুলি উঠেছিল কঠিন হয়ে; কিন্তু উপস্থিত সুকুমারের সমস্ত সত্ত্বা কেতকীর কণ্ঠস্বরের কোমল স্পর্শে অনির্ব্বচনীয় মধুর হয়ে উঠেচে। ললিতা পর্য্যন্ত বিহ্বল ভাবে চেয়ে আছে পিয়ানোর উপর কেতকীর দ্রুত সঞ্চারমান আঙুল-গুলির দিকে। আর অনুপম হালদার? স্বরচিত কবিতা এতগুলি

লোকের সামনে পড়তে পেল না বলে সে যে বিশেষ দুঃখিত, এ কথা তার দিকে চেয়ে একেবারেই মনে করা চলে না।

কয়েক মিনিট পরে গান সারা হোলো, কিন্তু সুরের ইন্দ্রজাল ঘর-খানিকে আচ্ছন্ন করে রইলো আরও বহুক্ষণ। লীলা আর সুধাংশুর কথাবার্ত্তা চললো অবিশ্রান্ত ভাবে এবং আর সকলে আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার গলার গান না শুনে জীবনের এতগুলো দিন অনর্থক গেছে ভাই কেতকী, ছেলে পড়ানর পাট তুলে দিয়ে তোমাদের এই কলকাতায় বসে বসে কিছুকাল সঙ্গীত-সুধাই পান করবো না কি ?

কেতকী মিষ্টি হাসিতে মুখ আলো করে জবাব দিল : বেশ তো, করুন না ; অন্ততঃ আমার দিক থেকে অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না।

সে তো ভালো করেই জানি ; কিন্তু আমার ভাইরা যে ক্ষমা করবে না।

আপনার ভাই ? তারা এলো কোথা থেকে ?

ওর নাম কি—জননী-জঠর থেকে নয় ; ইংরিজীতে তোমরা যাদের বলো 'কমরেড্'। তারা আমার অধঃপতন দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠবে।

মনের কোমল বৃত্তিগুলোর চর্চ্চা করাও কি আপনাদের কাছে বে-আইনী নাকি জয়ন্তদা ?

আমরা কোন আইন-কানুন মানিনে, এইটেই আমাদের আইন। আইন হোল বন্ধন আর তোমার গানের বন্ধন যে বড় সহজ, তাই বা বলি কি করে বলো তো ? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক আর নয় ; রাত অনেক হোল, আমি উপরে উঠলাম কেতকী।

নবপরিচিতদের নমস্কার জানিয়ে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

কেতকী এসে দাঁড়াল, সুকুমারের সোফাটার পাশে।

বাড়ী যাবেন না আপনি ?

'আপনি' বলার সম্মানটুকু সুকুমারের বরাবরের প্রাপ্য, সুতরাং সুকুমার সে জন্য বিস্মিত হোলো না। কিন্তু খট্‌কা লাগলো মূল কথাটায়। কেতকী তাকে অপমান করতে চায় না তো ?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুকুমার কেতকীর দিকে চাইলে।

ওদিকে সুধাংশু মিত্র তখন লীলাকে অনুচ্চকণ্ঠে বলচে—তা হলে সেই কথাই ঠিক রইল—কাল সন্ধ্যা ছ'টা, মেট্রোর লবিতে। কেমন ?

লীলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো এবং তার দুই চোখের তারায় ঘনিয়ে এলো রহস্য ও কৌতুকের ছায়া। ঘরের অপর প্রান্তের সোফা থেকে অনুপমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নিকটবর্ত্তিনী ললিতার দিকে চেয়ে অনুপম বলচে : আপনিই বা একা একা বসে থাকেন কেন, শুনুন ততক্ষণ আমার কবিতাটা—কিন্তু শোনবার আগে এটুকু জেনে রাখুন যে কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে এ কবিতা লেখা হয়নি, অর্থাৎ ডিটেকটিভ্ ঔপন্যাসিকদের ভাষায়,'the characters are entirely imaginary.'

অনুপমের পকেট থেকে চামড়া-বাঁধা খাতাখানি পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করলো ; তারপর সুরু হলো কবিতা পাঠ :

হঠাৎ তোমার চিঠি—"আসিবেন ত্রিশ্‌ মাসে"
কিঞ্চিৎ চিন্তিত করেচে,
অতিশয় দুর্ব্বোধ সুদীর্ঘ মৌনতা
ভেঙে কেন মোরে ডাক পড়েচে ?

সানিপার্ক, বালিগঞ্জ—কত আর দূর হবে,
ছুটিও রয়েচে হাতে পড়িয়া,
না-ই থাক 'অষ্টিন্,' তবু আমি যেতে পারি
দশ নম্বর বাসে চড়িয়া।
ডেকেছ কি প্রয়োজনে, লেখনি তো কিচ্ছুই,
আমি পারি কোন্ কাজে লাগিতে?
সিনেমায যেতে হবে? আমারে টানিবে কেন
ট্যাঁক-ভারি বন্ধুরা থাকিতে?
ফিলজফি বুঝিবার প্রয়োজন মিটিয়াছে,
দরকার নাই নোট টুকিবার,
তিবিশ হয়েচে পার, এ বুড়োবয়সে আর
সাধ নেই জেনে শুনে ঠকিবার।
খানাপিনা আছে কিছু? মোরে কেন তার মাঝে,
জানি না চামচ কাঁটা ধরিতে,
ঘুরাইযা দেয মাথা, খিল্‌খিল্ হাসি আর
ঝলমল্ জর্জ্জেট্ শাড়ীতে।
পাণিপ্রার্থীর ভিড় দেখাইতে সাধ যদি
দেখিব তা কল্পনা-নেত্রে
আমার 'অফার' নাই যেথা হয ডাকাডাকি
ভাঙ্গা মন নীলামের ক্ষেত্রে।

কবিতা পাঠ সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেতকী বললে: আপনার এই কবিতা বালিগঞ্জের বিধানে একেবারে সিডিশন্।

অনুপম বললে, কেন ?

আপনাকে সত্যিই কেউ চিঠি লিখেছিল কি না জানিনে, কিন্তু আপনি বালিগঞ্জের সব ক'টি মেয়ের প্রতি কটাক্ষ করেচেন আপনার কবিতায় এবং কতকটা অবিচার।

লীলা বললে, আমিও তোমার সঙ্গে একমত ভাই কেতকী। উপরন্তু আমার মতে, অনুপমবাবু নিজের কিছু দুর্ব্বলতার পরিচয়ও দিয়ে ফেলেচেন তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে।

অনুপম বললে, তার জন্যে আমি লজ্জিত নই লীলা দেবী, কারণ আমার বিশ্বাস, জেনে হোক আর না জেনেই হোক, লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই নিজেকে ব্যক্ত করি। মুখের যে কথা অত্যন্ত সামান্য মনে হয়, সামান্য চিঠির পাতায় তাই একেবারে অসামান্য হয়ে উঠে কেন বলতে পারেন ?

কেতকী বললে, তা বলতে পারি না। কিন্তু কোথায় বসে লিখলেন এই বালিগঞ্জ-নিধন-পর্ব্ব ? পাঞ্জাবী হোটেলের কামরায়, না, চটকলের কুলীদের বস্তীর মাঝখানে ?

অনুপম ক্ষুণ্ণ হলো না ; বললে, কবিতার উপলব্ধিটাই বড় কেতকী দেবী, তার আঁতুড় ঘরের ঠিকানাটা অনাবশ্যক। কিন্তু সত্যি যদি এই কবিতায় অপ্রিয়-ভাষণের অপরাধ ঘটে থাকে, আশা করি অসত্য-ভাষণের অপরাধ ঘটে নি।

লাঠী আর বালাপোশটা কাঁধে ফেলে অনুপম উঠে দাঁড়াল ; তারপর বললে, কয়েকদিনের মতো কলকাতার কাছে ছুটি নিয়েচি কেতকী দেবী, অর্থাৎ পাড়ী জমাতে হবে এক সাহিত্য সম্মিলনে। ফিরে এসে যেন দেখি, আমার কবিতায় এই কটি লাইন নতুন করে যোগ করবার সময় হয়েচে।—

শুধু আড্ডার তরে যদি এই আহ্বান
সে কথাটি লিখো মণি খুলিয়া,
ভক্তের ভিড় নাই, আশ্বাস দাও যদি,
দশ নম্বরে যাব চলিয়া।

কি বলেন, সুকুমার বাবু ?

হাসতে হাসতে অনুপম সবাইকে নমস্কার জানালে এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধাংশু বললে, ক্যাডাভেরাস !

কেতকী বললে, চমৎকার ! এতো ভালো লাগে আমার অনুপম বাবুকে…

সুকুমার তখনও সোফার উপর বসেছিল। কেতকীর চোখ পড়লো সেই দিকে। তার পর অনুচ্চকণ্ঠে বললে, রাত দশটা হলো, উপরে চলো, খেয়ে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে বাড়ী চলে যাবে। আর কাল একটু বেলা থাকতে তোমার আসা চাই, আমরা কার্ণিভালে যাব, তুমি সঙ্গে থাকবে।

দু'জনে অগ্রসর হলো সিঁড়ির দিকে। লীলা আর সুধাংশু ইতিমধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ী-বারান্দার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েচে—ষ্টার্ট দেওয়া হয়েচে তার মোটরে।

"কাল ছ'টা, মেট্রোর লবিতে—ডোণ্ট্ ফরগেট্"—

সুধাংশু গাড়ীতে উঠে পড়লো।

পরদিন বিকেল ছটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচ-সাত বাকি। মেট্রোর লাউঞ্জে একটী ছেলেকে আমরা বহুক্ষণ ধরে অভিনিবেশ সহকারে

ম্যুরিয়েল্ পেন্টিংগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে দেখলাম। অল্পক্ষণ পরে প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল একটী মেয়ে। লীলা আর সুধাংশু নিশ্চয়ই।... না, চিনতে আমাদের ভুল হয় নি।

টিকিট কিনে তারা ঢুকলো সিনেমার ভিতর। তখনও ছবি সুরু হতে দু' এক মিনিট দেরী আছে। সীট্ দখল করে সুধাংশু বললে, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে আপনি হয়তো শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌছতে পারবেন না।

কেন ?

শ্রীমতী কেতকী দেবী কাল সদলে কার্ণিভ্যালে যাবেন বলে নোটীশ দিয়েছিলেন।

সেটা ঠিক আমাকে উপলক্ষ করে নয়। দাদা আমাদের পিসতুতো বোন ললিতাকে নিয়ে এসেচেন কলকাতায়—কাল আপনি দেখেচেন ললিতাকে, তাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসাই কেতকীর উদ্দেশ্য।

তা হলেও, আপনাকে হয়ত তাঁরা এক্সপেক্ট্ করবেন।

কেতকী আমাকে ভাল করে জানে, সে এতে আশ্চর্য্য হবে না। তা ছাড়া, ছোট ছেলেমেয়েদের মতো কার্ণিভালের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

ইতিমধ্যে আশপাশের সমস্ত আসনগুলি ভরে উঠেচে; চারিদিকে বহুকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন, বিচিত্র বর্ণ ও সুগন্ধির সমারোহ। পাউডার এবং সেণ্ট্ এর সঙ্গে মিশেচে সিগারেটের সুরভি, মেয়েদের রেশমী শাড়ী আর গাউনগুলির উপর পড়েচে সিলিং-বিচ্ছুরিত উগ্র আলোর অঞ্জলি। লীলা প্রসাধনে পারিপাট্য ছিল, কিন্তু নিজের চেয়ে প্রসাধনকে প্রাধান্য দেওয়া ওর অভ্যাস নয়। তার শাদা শিল্কের শাড়ী রূপোলী পাড় ঘন

কালো রংএর ব্লাউসের উপর দিয়ে যেখানে ঘুরে গেছে, সেখানে আপনার সুডৌল কণ্ঠ ও গ্রীবার ঈষৎ আভাস দিতে লীলা বিস্মৃত হয় নি।

উগ্র আলোগুলি একে একে নিস্তেজ হয়ে এলো, সিলিং থেকে অডিটোরিয়াম পর্য্যন্ত ছেয়ে গেল হালকা, নীলাভ আলোয়। মেট্রোটোন সুরু হয়েচে ছবির পর্দ্দায়। কিন্তু সুধাংশুর চোখ তখন পর্দ্দার দিকে নয়। পার্শ্ববর্ত্তিনীর সান্নিধ্যটুকু সুধাংশু মনে মনে শুধু অনুভব করে পুলকিত হয়ে উঠচে। সুধাংশু ইতিপূর্ব্বে অনেকবার, ঠিক এমনি ভাবে সঙ্গিনীদের পাশে বসে ছবি দেখেচে, সুতরাং আজকের ঘটনা তার কাছে প্রথম থেকে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আনন্দ নিয়ে আসে নি। ও জানতো যে লীলা আসবেই এবং ঠিক এমনি করেই তারা পাশাপাশি দুটি সীটে বসে সিনেমা দেখবে। অনেক, অনেক মেয়ে এসেচে ইতিপূর্ব্বে সুধাংশুর জীবনে; এক সময় প্রতিদিন ছ' ঘণ্টা হিসেবে ফ্লার্ট করা তার পড়াশুনোর অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাপের একমাত্র ছেলে, যাকে বলে সুপুরুষ এবং শিক্ষিত—এক কথায়, বিধাতার দেওয়া পাসপোর্ট ছিল তার বালিগঞ্জের অন্দরমহলে। এখনও সে নিজের ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারগুলো থেকে চার পাঁচটী মেয়ের প্রেমপত্র খুঁজে বা'র করতে পারে। প্রেমপত্র বলেই যে সবাই তাকে হৃদয়-নিবেদন করেছিল, এ কথা সুধাংশু আপনাদের বলতে চায় না। কেউ চেয়েছিল তার স্কন্ধে ভর করে দিনকতক সিনেমা—থিয়েটার—রেস এবং আরও অনেক কিছু দেখে-শুনে নিতে, কেউ বা সত্যিই তাকে ভালবাসতে পারতো যদি না সুধাংশু হঠাৎ আর একজনের প্রতি অত্যন্ত অধিক মনোযোগপরায়ণ হয়ে উঠতো। একজনের সাধ ছিল কন্টিনেন্ট টুর করবে; বাড়ীতে ছিল অর্থের অসদ্ভাব এবং সে হিসেবে সুধাংশুকে টার্গেট্ করে মেয়েটী খুব বেশী অন্যায় করে

নি। সুধাংশুও সমুদ্র পার হবার জন্য প্রায় তৈরী হয়ে উঠেছিল, এমন কি কয়েকটা দামী সুটের অর্ডার পর্য্যন্ত দিয়েছিল চৌরঙ্গী টেলারিংএ; সেই সময় সুধাংশু মেয়েটির সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করে সহসা পোষাকগুলির ডেলিভারি নেবার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেল! মনে মনে সুধাংশু দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে কেবল একটি কথাই উচ্চারণ করেছিল: আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সেই পরম বিস্ময়কর তথ্যটি সংক্ষেপে এই—

মেয়েটি সুধাংশুকে সত্যি ভালবাসে নি। তার জন্যে সুধাংশুর দুঃখ ছিল না; সুধাংশু তার হৃদয়কে 'আইসফ্রুটের' মত পথে পথে ফিরি করে বেড়ায় না, কিন্তু সত্যিই সে দুঃখ পেল সেবার। তার রোমান্স-বিলাসী জীবনে সেই দিল প্রথম আঘাত। এক দিনে তার বয়স যেন পঁচিশ বছর এগিয়ে গেল, অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল শতগুণ! ভালবাসে নি, কিন্তু ভাণ করেছিল। আর সে কি বিচিত্র মোহ-বিস্তার! নইলে সুধাংশু এক সঙ্গে দুখানা প্যাসেজ বুক করবার মতো উন্মাদ হয়ে উঠলো কি করে। কি করে এই রহস্যের আবরণ গেল ঘুচে, তাও এক পরম উপভোগ্য কাহিনী। সেদিন সকালে (মাস ছয়েক আগের একটি শুভ্র সকাল) সুধাংশু খবরের কাগজের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছিলো। খুসী এবং খেয়ালের খাতিরে সুধাংশু তখন ইংরিজী দৈনিকগুলোয় মাঝে মাঝে একটা আধটা প্রবন্ধ লিখতো। প্রায় শেষ হয়ে এসেচে প্রবন্ধ, আর কয়েকটা প্যারা লিখতে পারলেই হয়, এমন সময় এলো নীল লেফাফায় ঢাকা একখানি চিঠি—

চিঠিখানি কার অনুমান করে নিতে সুধাংশুর বিলম্ব হয় নি, কিন্তু চিঠি পড়ে সুধাংশু কয়েক মিনিট একেবারে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল; কি যে তার অর্থ সুধাংশু হঠাৎ তা উপলব্ধি করতে পারলে না। বার

বার পড়লো এবং প্রতিবারই তার মনে হ'ল যে জেগে জেগে সে অত্যন্ত কুৎসিত একটা স্বপ্ন দেখচে। চিঠিখানি ছোট, কিন্তু কি বিচিত্র তার অর্থ! চিঠির প্রত্যেকটি কথা সুধাংশু আজও মনে করতে পারে।

সুপ্রিয়,

এতদিনে তোমার ও আমার জীবনের পরম উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে চলেচে। অনেক অনুরোধ এবং অনেক অশ্রুজলে সুধাংশুকে রাজী করিয়েচি। যে জাহাজে তুমি প্যাসেজ নেবে, আমরাও সেই জাহাজেই যাব, এটুকু জেনে রেখো। আনন্দের আতিশয্যে জাহাজে দেখা হলেই যেন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে ফেলো না; একটু সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাদের দুজনকে। নইলে সুধাংশুর সেনসিটিভ্ মনে যথেষ্ট আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। যখন এতগুলো টাকা খরচ করে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলেচে, তখন ভদ্রতার খাতিরে, অন্ততঃ ওদেশে না পৌঁছান পর্য্যন্ত, আমাদের মধ্যে একটা সৌজন্যের আবরণ থাকা উচিত।

তুমি দেশ থেকে কবে ফিরবে জানিয়ো। আমিও আত্মীয় স্বজনদের কাছে কথাটা প্রচার করেচি, বিশেষ কোন আপত্তি হবে না কা'রও। আশা করচি, শিগগির দেশ থেকে ফিরবে, কারণ, এখনও তোমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার। এদিকে তুমি বাড়ী যাবার পর থেকে কলকাতা যেন ভাল লাগচে না। সুধাংশুর কাছে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্চে। তুমি কাছে থাকলে মনে তবু জোর পাব। শিগগির চলে এসো, কেমন?

তোমার
ইলা

সুপ্রিয়! সুপ্রিয়! কে এই সুপ্রিয় তা অবশ্য আজও সুধাংশুর অজ্ঞাত, কিন্তু সে যে ইলার হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর, তা চিঠিখানি বার কয়েক পাঠের পর সুধাংশু নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করতে পারলো। ইলাকে নিয়ে কন্টিনেণ্ট ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য এই সুপ্রিয়র নেই, সুতরাং ইলা তাকে

ভুলিয়ে একটা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে চেয়েচে—ভালবাসার খাতিরে মেয়েরা কতদূর যেতে পারে, তাও সুধাংশু স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলো। কিন্তু চিঠিটা তার কাছে এসে পৌঁছল কি করে? ভুলই হবে নিশ্চয়—কিন্তু ইলার পক্ষে কি মারাত্মক আর সুধাংশুর পক্ষে কত বড় আবিষ্কার! ইলা বোধ হয় একই দিনে দুখানি চিঠি লিখেছিল—তাকে আর সুপ্রিয়কে; তার পর বোধকরি একের চিঠি গিয়ে আশ্রয় নিল, আর একজনের নাম লেখা লেফাফার মধ্যে। কি চমৎকার ভুল, সুধাংশুর জীবনের কি রোমাঞ্চকর উপলব্ধি!

সত্যিই রোমাঞ্চকর উপলব্ধি! সুধাংশু প্রথমে অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তারপর উত্তেজনা যখন ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এলো, সুধাংশু সমস্ত বিষয়টা তখন আর এক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো! ইলা অত্যন্ত অন্যায় করেচে, প্রণয়ের ভাণ করে তার সঙ্গে তামাসা করেচে এবং সুধাংশু আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে যখন তার কাছে মনের কোমল অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করেচে, তখন এই মেয়ে মনে মনে স্মরণ করেচে এই সুপ্রিয়কে এবং সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হলে সুধাংশুর মানসিক দুর্ব্বলতা নিয়ে কি চমৎকার হাসি তামাসাই না চলেচে তাদের দুজনের মধ্যে! এগুলো অন্যায় নিশ্চয়, এর জন্য সমস্ত নারীর প্রতি অশ্রদ্ধায় সুধাংশুর মন বিষিয়ে ওঠাও আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সুধাংশুর চোখের সামনে যেন একটা নূতন জগৎ ধরা পড়লো, উঠে গেলো অন্ধকার যবনিকা। হঠাৎ ওর মনে হলো, ইলা ছোট নয়, অন্ততঃ সুপ্রিয়র কাছে। সুপ্রিয়কে ও ভালবাসে। তার সে ভালবাসা পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর প্রবাহের মতো কোন বাধাকে স্বীকার করতে চায় না, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঠেলে এগিয়ে যাওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। সুপ্রিয়কে ও-চোখের আড়াল করবে না

বলেই তো সুধাংশুকে ও টানবার চেষ্টা করেছিল মুঠির মধ্যে ; অর্থের অভাব, বিদেশের দূরত্ব কিছুই মানবে না ইলা, সর্ব্বদা ঘিরে রাখবে ওর প্রেমাস্পদকে তার উপস্থিতি দিয়ে, কামনা এবং বাসনা দিয়ে। এর জন্যে আর একটি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা? একটা গৌণ ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

সুধাংশু রাগ করলো না, কড়া ভাষায় একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখলে না ইলাকে। পাসপোর্টের চেষ্টা চলতে লাগলো তেমনি। তবে দুজনের নয়, একজনের। ছাড়পত্রখানা পেলেই সুধাংশু ইলার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে, মনে মনে ঠিক করে রাখলো। ইতিমধ্যে ইলার সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত দরকার। সুধাংশু তার বাড়ীতে গেলো, কিন্তু ইলা সেখানে নেই। কোথাও তার খোঁজ মিললো না। হঠাৎ ইলা যেন এই প্রকাণ্ড সহরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চিঠি সম্বন্ধে যে মারাত্মক ভুল করেছিল, তা উপলব্ধি করতে ওর হয়তো বেশী দেরী হয় নি। কিন্তু কোথায় গেল ইলা, কতদূরে? সুপ্রিয়ও যে বিলেত যায় নি এখবরও সে রেখেচে ; কারণ শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রিয় প্যাসেজ নাকচ করেচে, এখবরটুকু পোর্ট-পুলিসের মারফতে সংগ্রহ করা সুধাংশুর পক্ষে কঠিন হয়নি।

কিন্তু কোথায় গেল ইলা ; কোথায় গেল সুপ্রিয়, কোথায় গেল তা'রা দুজনে?

হালকা নাচ গানের ছবি, সেদিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার প্রয়োজন ছিল না। এমনিই বেশ লাগছিল। কিম্বা সুধাংশু সত্যি হয়তো ছবি

দেখেনি, ও অনুভব করছিলো তার সমস্ত চেতনা দিয়ে লীলার উপস্থিতিকে। লীলাকে তার ভাল লাগচে। কাল রাত্রিতে ও যখন লীলার মুখে শুনলো যে সুকুমারের সঙ্গে কেতকীর মান অভিমানের পালা চলেচে, তখন ও কতকটা বাহাদুরী দেখাবার লোভে লীলাকে নিয়ে সিনেমায় আসবার প্রস্তাব করেছিল। সত্যি, সুধাংশু এ সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার সময় পায় নি। কিন্তু মেট্রোর অডিটোরিয়মের এই বিশেষ পটভূমিকায় লীলাকে ওর ভাল লাগলো। কখন কাকে ভাল লাগবে, এ কথা নিশ্চয় করে বলা চলে না। পথ চলতে যে ফুলের দিকে সহজে দৃষ্টি পড়ে না, মীনা-করা মোরাদাবাদী ফুলদানীতে তার দেখি স্বতন্ত্ররূপ, নূতনতর ব্যঞ্জনা। আবার এও হতে পারে যে বিশেষ কোন মানুষকে বা বিশেষ কোন পদার্থকে সত্যিই আমাদের ভাল লাগে না; আমরা ভালবাসি স্থান ও কালের যোগাযোগকে, চারিপাশের যে পরিমণ্ডল, তাকে। অন্ততঃ সুধাংশুর সম্বন্ধে এ কথা আজ খুব বেশী করে খাট্‌লো। কেতকীদের চায়ের আসরে লীলাকে ও ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার দেখেচে, কিন্তু লক্ষ্য করে নি। কাল কি জানি কি ছিল ড্রয়িংরুমের আবহাওয়ায়, লীলাকে ও ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে নিল আর আজকের এই অনতি-উজ্জ্বল, সুগন্ধ-মূর্চ্ছিত প্রেক্ষাগারের মধ্যে তাকে নূতন করে উপলব্ধি করলো।

সন্তর্পণে সুধাংশু হাত রাখলো লীলার হাতের কাছাকাছি। লীলা হাত তুলে নিল না। ওর কোমল, সুরভিত রেশমী শাড়ী সুধাংশু যেন স্পর্শ করতে পারলো। ছবির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লীলা ফিরে চাইলো সুধাংশুর দিকে। কথা বললো না তারা কেউই; তবু যেন অনেক কথাই বললো তারা। চোখের প্রদীপ জ্বেলে দেখলো তারা পরস্পরকে। কেটে

গেল অন্ধকার, চিনলো একজন আর একজনকে। দূর দক্ষিণ সাগর থেকে বাতাস বয়ে গেল তাদের মাথার উপর দিয়ে, মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো ধূসর বালুচরের কূলে কূলে নারিকেল-কুঞ্জবীথিকা!

শেষ হলো ছবির পালা।

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিশোরী রাত্রি কুয়াসার ঘোমটা টেনে সমস্ত সহরকে অপরূপ করে তুলেচে। সহজ চোখে সহরের এই রাত নটার হয়তো বিশেষ কোনরূপ নেই, কিন্তু সুধাংশু আর লীলার কাছে কুয়াসা-গুণ্ঠিত রাত্রির অর্থ আজ ভিন্ন!

সুধাংশু বললে, বাড়ী যাবেন এখন?

লীলা বললে, কেন?

অর্থাৎ বাড়ী যাওয়ার কথাটা এখন অপ্রাসঙ্গিক। সুধাংশু তার জন্য ব্যাকুলও নয় বিশেষ। সুধাংশু নিজের গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিল, লীলা বসলো তার পাশে। গাড়ীর রেডিও সেট্‌টা দিলে খুলে। গাড়ী ছুটলো রেড রোড্ ধরে—বাতাসের সমুদ্রে জাগলো সুরের তরঙ্গ। লীলার সুরভিত চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করতে লাগলো সুধাংশুকে। মুহূর্ত্তে সমস্ত মাঠ রূপকথার রাজপুরীর মত স্বপ্নময় হয়ে উঠলো। সুধাংশুর মনে হ'তে লাগলো, এ যেন তার পরিচিত নিউ-মডেল ওল্‌ড্‌স্-মোবিল নয়; ভেনিসের অপরূপ একটি রাত্রিতে 'গণ্ডোলা'য় চড়ে তারা যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বা'র হয়েচে।

কার্নিভাল!

অসংখ্য মানুষের ভিড়, নানা কণ্ঠের অজস্র কোলাহল, চতুর্দ্দিকে অফুরন্ত আলো আর উৎসব! ভিতরে পা দিয়েই ললিতার চোখের সামনে

যেন ইন্দ্রজাল নেমে এলো। ফারকোটপরা সুবেশা তরুণীদের ভিড়, লংকোট-পরা সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জনতা ; একদল মেয়ে হয়তো 'মেরী-গো-রাউণ্ড' চেপে ঘুরপাক দিচ্চে, আর এক জায়গায় বুঝি 'ডেয়ার ডেভিল মোটর জাম্প' হবে, কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষের দল এক ঘণ্টা আগে থেকেই তার জন্য অপেক্ষা করচে। বামদিকের সারিবন্দী ঘরগুলোয় চলচে জুয়োখেলা, সব চেয়ে ভিড় সেই দিকটায় !

বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে ললিতা সুকুমার আর কেতকীকে অনুসরণ করছিল। কেতকী আর সুকুমার চলেচে পাশাপাশি, গল্প করচে তারা একমনে, যেন গল্প করা ছাড়া এত বড় এই কার্ণিভালের মধ্যে তাদের আকর্ষণের কোন বস্তু নেই। চতুর্থ ব্যক্তি নেই ওদের দলে যে ললিতা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নেবে। অবশ্য সুকুমারকেও জিজ্ঞাসা করা চলতো, কিন্তু সুকুমারকে দেখে ললিতার কেমন ভয় হয়,—এত কম কথা বলে সুকুমার আর এত গম্ভীর ! কেতকীর সঙ্গে ও যখন আলাপ করে, তখনও ওর মুখে হাসি দেখা যায় কদাচিৎ ! কেমন একটা অনির্দেয দূরত্ব দিয়ে সুকুমার তাকে আড়াল করে রেখেচে। এর চেয়ে বরং জয়ন্তদার সঙ্গে ললিতা সাহস করে দু-একটা কথা বলতে পারে, যদিও সুকুমারের চেয়ে জয়ন্ত দশ বার বছরের বড় ! জয়ন্তদা আসবেন বলেছিলেন ওদের সঙ্গে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আসা হোলো না। তাঁর এক সহপাঠী কিছুকাল ধরে জেলে ছিল, আজ হঠাৎ ছাড়া পেয়েচে। তখুনি তিনি ছুটলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। দক্ষিণাবাবুর পায়ের বাতের ব্যথাটা কালরাত্রি থেকে হঠাৎ আবার চাড়া দিয়েচে, তিনি তো সকাল থেকেই জবাব দিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং ওরা তিন জনেই আসতে বাধ্য হোলো।

রাত বাড়চে। কুয়াসা ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠতে লাগলো আর ভিড় লাগলো বাড়তে। হঠাৎ একটা লোক অদ্ভুত বেশে একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। মাথায় কাণ-ঢাকা মঙ্কি-ক্যাপ্, গায়ে একটা লম্বা, ঢিলে কোট, গলায় মোটা গলাবন্ধ—এতগুলি পরিচ্ছদের আড়ালে নিজেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে, থমকে দাঁড়াল কেতকীর সুমুখে।

কেতকীও প্রথমটা চিনতে পারে নি। কিন্তু খানিকক্ষণ লোকটার মুখের দিকে ভাল করে চেয়েই কেতকী একেবারে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলো।

—আপনি—অনুপমবাবু! আপনাকে এখানে পাব এ আশা একেবারেই করিনি।

—স্থান কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, এতো আপনি জানেন।

—কিন্তু আপনি যে বাংলার বাইরে যাচ্চেন বলে বিদায় নিয়ে এলেন কাল।

—কিন্তু আজই যেতে হবে, এমন কোন কথা বোধ হয় হলফ করে বলে আসি নি।

—এখন তাই মনে হচ্চে।

অনুপম এবার সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে, ড্রয়িংরুমের বদ্ধ আবহাওয়ার চেয়ে কার্ণিভালের খোলা হাওয়ায় আপনাকে স্বাস্থ্যবান মনে হচ্চে।

—হ্যাঁ একটু নির্ব্বিঘ্নে নিঃশ্বাস নিতে পারচি।

অনুপম সুকুমারের পিঠে হাত রেখে বললে, আমারও অবস্থা ঠিক আপনারই মতো। ড্রয়িংরুমের চারিপাশে যেন ভদ্রতা আর ভব্যতার

পাহারা। সেখানে যে সব বিষয়ে সাধারণতঃ আলোচনা চলে সেগুলি সম্বন্ধে অন্য কোন সময় কেউ সিরিয়সলি চিন্তা করে না। তবু মাঝে মাঝে গিয়ে পড়ি শ্রীমতী কেতকীর চা-চক্রে, জীবনের একটা দিক যাতে একেবারে না-দেখা থেকে না যায়!

আজও কি এখানে জীবন দেখতে এলেন নাকি?—কেতকী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো।

নিশ্চয়। কার্ণিভালকে আপনি জীবনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলতে পারেন, ইচ্ছে করলে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমি আজ ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। দেখুন, কত লোক আসচে, মিনিট কয়েক পরেই তারা যাচ্চে চলে; একদিকে প্রবেশ, একদিকে প্রস্থান—জীবনের সঙ্গে মিল কি কিছুই নেই? কিন্তু দার্শনিক আলোচনা থাক। এটা দর্শনের ক্ষেত্র নয়, দর্শনীর। চলুন একটু হৈ চৈ করা যাক।

সুকুমার একটু বিব্রত হয়ে বললে, কি রকম বলুন তো?

—ঠিক আর পাঁচজনের মতো। হয় একটু মেরী-গো-রাউণ্ডে চড়া, কিম্বা ঐ উঁচু জায়গাটা থেকে চোখ বুঁজে শ্লোপ বয়ে একেবারে নিচে এসে পৌছনো,—যা হয় একটা। Something or anything.

—'কি হলো আপনার অনুপমবাবু'—কেতকী জিজ্ঞাসা কবলো—'সদ্য একটা নতুন বই বিক্রী করে এসেচেন বুঝি?'

—আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। সত্যি, হঠাৎ এতগুলো টাকা পাওয়া যাবে ভাবতেই পারিনি। সেগুলি বা'র হবার পথ পাবার জন্য ওভার কোটের পকেটে হাহাকার করচে। যতক্ষণ এর ভার কিছু লাঘব না হচ্চে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারবো না, এ আমি জানি। চলুন, চলুন—রাত ক্রমশঃ বাড়চে।

সত্যি পাগল হলেন নাকি অনুপমবাবু?—সুকুমার একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললে।

—আশ্চর্য্য কি! মাঝে মাঝে ধরা-বাঁধা জীবনের নিয়মগুলো ভেঙ্গে খানিকটা ছেলেমানুষী করবার সাধ আপনার হয় না, সুকুমারবাবু?—এই যাকে বলে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া, ঠিক তাই? কি একটা বইয়ে পড়েছিলাম: আদিম বর্ব্বরতা আছে মানুষের রক্তে রক্তে মিশে; সাধারণতঃ সেই পোকাগুলো থাকে ঘুমিয়ে এবং কখনও কখনও তারা ঘুম থেকে উঠে উৎপাত সুরু করে দেয়। এরকম আপনি কখনও বোধ হয় অনুভব করেন নি?

না।

তা হোক, আজ আমার অনুরোধে একটু অভদ্র হোন সুকুমারবাবু, শ্রীমতী কেতকী তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবেন না। আপনার এই নিরীহমূর্ত্তি দেখতে দেখতে ওঁর চোখে ক্লান্তি এনে দেবেন না। ঘটতে দিন একদিনের মতো সামান্য একটু বিপ্লব। ওদেশের কার্ণিভালগুলোর কথা পড়েন নি কাগজে? ছেলেমেয়েরা কত অনায়াসে মুখোস পরে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করে, নাচে, গান করে—তাদের প্রাণের খুসীর জোয়ার ভাসিয়ে দেয় সমস্ত তাঁবুগুলো!

—ওতে মানুষের কতকগুলো নীচ প্রবৃত্তির খোরাক জোগান হয়।

—কিছু খোরাক পেলে সে প্রবৃত্তিগুলো সুস্থ এবং সবল হয় সুকুমার-বাবু; একেতো আমাদের প্রবৃত্তির অনেকগুলোই ভয়ানক ছোট, তার-ওপর যদি সেগুলো অসুস্থ এবং বিকৃত হয়ে ওঠে তখন বেঁচে থাকা দুষ্কর। কিন্তু আবার তত্ত্ব কথায় এসে পড়লুম; চলুন, তর্ক আপনার সঙ্গে আর একদিন করবো, আজ ওই কাঠের ঘোড়াগুলির উপর সওয়ার হয়ে কিছু-

ক্ষণ কাঞ্চিপুর-বর্দ্ধমান করে আসা যাক। সময় এখানে বড় সংক্ষেপ, দেখচেন না, সব যেন ওই মেরি-গো-রাউণ্ডের বিরাট চাকাটার মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরচে।—সময় নেই। সবই এখানে দ্রুত, ব্যস্ত, উচ্ছৃঙ্খল।

রেড্ রোড ধরে ক্রাইস্লার ছোটে; রাখাল কই?
দীপজ্বালা মাঠ কাঁদে ব্যথায়।
ওপারে ফার্পো—লিপষ্টিক্ আর রুজের দেশ,
রুশ-র্যাফ্‌শড়ি শোনো সেথায়।

এখানে এসে প্রেমের ব্যঞ্জনা আলাদা হওয়া দরকার, ভালবাসবার ভাষায় গ্ল্যামার থাকা চাই, থাকা চাই গতি।—চলুন, চলুন।

অনুপমেব প্রবল উচ্ছ্বাসেব কাছে কারও কোন যুক্তিই টিঁকলো না, এসে দাঁড়াল সবাই মেবী-গো-রাউণ্ডেব কাছে। তখনও ঘুরে চলেচে তাব বিরাট চাকা, ঘোড়াব পীঠে একটী মেয়েব খোঁপা-বাঁধা চুল হঠাৎ একেবারে বিপর্য্যস্ত হযে ভেঙ্গে পড়েচে; ফিবিঙ্গী একটী ছোকবা বোধ কবি তার প্রণযিনীকে বসিযেচে তাব পাশে এবং প্রসাবিত বাহু দিযে জড়িয়ে ধবেচে তার ক্ষীণ কটিদেশ! কিছুক্ষণ দাঁড়িযে ওদের দেখতে হলো, তাবপর থামলো চাকা, নামলো সবাই একে একে! অনুপম ইতিমধ্যে যথাস্থানে মূল্য দিযে সওযার হবার অনুমতি নিযে এসেচে। অনুপম নিজেই সর্ব্ব-প্রথম উঠে বসলো একটা ঘোড়াব পীঠে এবং তার সেই কাণঢাকা টুপী-পবা অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখে কেতকী পর্য্যন্ত হেসে ফেললো। বললে—Gay Cavalier!

এবাব ওঠবাব পালা ওদের।

অনুপমের পাশের ঘোড়াটায় বসিয়ে দেওয়া হলো ললিতাকে। ঘোড়ার মাথাটা ললিতা প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে জড়িযে ধরলো।

অনুপম বললে, সোজা হয়ে বসুন, এখন থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। ঘোরবার সময় নিতান্ত যদি বিব্রত বোধ করেন, হাত বাড়িয়ে আমায় ধরে ফেলবেন। এসব বিষয় আমি অত্যন্ত নিরাপদ মানুষ, ভয় করবেন না আমাকে।

ভয়ের সঙ্গে লজ্জায় ললিতার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। এই শীতের রাত্রিতেই হঠাৎ সে ঘামতে সুরু করলো। কিন্তু নেমে যেতেও তার অত্যন্ত সঙ্কোচ হতে লাগলো—কি ভাববে সবাই! হাসবে হয়তো পাঁচজনে!

শেষ পর্য্যন্ত সুকুমার এবং কেতকীও উঠে বসলো পাশাপাশি দুটী ঘোড়ায়।

টান পড়লো চাকায়, এলো গতির জোয়ার, ঘুরতে লাগলো সেই বিরাট চাকা। পার্শ্ববর্ত্তীদের হাসির কলরব ললিতার কাণে এসে পৌছচ্চে, অর্থাৎ সবাই প্রাণপণে উপভোগ করচে এই গতির আনন্দ! অনুপম হালদার ইতিমধ্যে কি একটা ইংরিজী কবিতা তারস্বরে আবৃত্তি করতে সুরু করেচে! গোলযোগের মধ্যে ফিরিঙ্গী একটী মেয়ের মুখ থেকে চকলেট গেল মাটীতে পড়ে—কিন্তু এখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই! কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতে ললিতার মাথার মধ্যে সব যেন একাকার হয়ে এলো, ঘুরতে লাগলো এই বিরাট কার্ণিভ্যালের সবগুলো তাঁবু, সবগুলো আলো এবং সবগুলো মানুষ! চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এলো। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর ললিতার মনে হেলো কে যেন তাকে সেই ঘূর্ণায়মান কাঠের ঘোড়ার উপর থেকে খানিকটা উপরে তুলে, হঠাৎ সজোরে নিচে ফেলে দিল···

চারিদিকে উঠলো প্রবল কোলাহল, দর্শক হিসেবে যারা কৌতুক উপভোগ করতে এসেছিল, তাদের মুখ সহসা অন্ধকার হয়ে গেল—

থেমে গেল মেরী-গো-রাউণ্ডের চাকা! ললিতার অচৈতন্য দেহ একেবারে মাটীর উপর লুটিয়ে পড়েচে। কার্ণিভ্যালের কর্ত্তারা ছুটে এলেন, সুকুমার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ঝুঁকে পড়লো ললিতার মুখের কাছে।...নিশ্বাস পড়চে তখনও, কিন্তু সহজে বোঝবার উপায় নেই। কেতকীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, অনুপম তাড়াতাড়ি তার মাথার টুপীটা খুলে তাই দিয়ে ললিতার মাথার কাছে হাওয়া করতে লাগলো! ললিতা তার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে পড়েচে; কার্ণিভালের লোকজনের সাহায্যে তাকে সোজা করে' শোয়াবার চেষ্টা করতেই ললিতা অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো!

কে একজন বললে, সম্ভবতঃ ফ্র্যাকচার—হাতে লেগেচে বোধ হয় খুব!

অনুপম এতক্ষণে সত্যি বিচলিত হোল। বললে, তা হ'লে তো এখুনি একটা গাড়ী ডাকা দরকার, হাসপাতালে যেতে হবে আমাদের...

আজকের এই দুর্ঘটনার জন্য সেই দায়ী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু সুকুমারও এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে কম অপ্রস্তুত হয় নি। সেই তো সঙ্গে করে ওদের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেচে। সঙ্গী হিসেবে ললিতাকে মেরী-গো-রাউণ্ডে উঠতে না দেওয়াই তার উচিত ছিল! ছি, ছি, দক্ষিণাবাবু তাকে কত বড় দায়িত্বহীন মনে করবেন, জয়ন্তদাকেই বা সুকুমার কি কৈফিয়ৎ দেবে?

একটু ভেবে সুকুমার বললে, অনুপমবাবু, আপনি কেতকীকে নিয়ে বাড়ী যান—বাইরে ওঁদের গাড়ী অপেক্ষা করচে! আমি ট্যাক্সিতে ললিতাকে নিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালে যাচ্ছি। সেখানে আমার চেনাশুনো লোকের অভাব হবে না!

অনুপম প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হোলো না, কেতকীও সঙ্গে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো!

কিন্তু সুকুমার বললে, অনর্থক ভিড় বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না কেতকী, তা ছাড়া রাত অনেক হয়েচে। শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবাবু না আবার তোমায় খুঁজতে বেরিয়ে একটা য়্যাকসিডেণ্ট্‌ করে ফেলেন! তোমার বাড়ী যাওয়াই দরকার·· আমি একাই সমস্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।

কেতকী সুকুমারের কথার উত্তর দিল না, কেতকীর মুখের দিকে চেয়ে দেখবার অবসরও ছিল না কা'রও, কিন্তু কেতকীর সুশ্রী, পরিপূর্ণ মুখখানি তখন হঠাৎ যেন অকাল-মেঘে থমথমে হয়ে উঠেচে!

শেষ পর্য্যন্ত সুকুমারই ললিতাকে নিয়ে উঠলো ট্যাক্সিতে। কার্ণি-ভালের লোকজন এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

খোলা ট্যাক্সীর দুরন্ত বাতাসে ললিতার চেতনা যেন ক্রমে ক্রমে ফিরে আসতে লাগলো! প্রথমটা তার মনে হোলো, এখনও সে মেরী-গো-রাউণ্ডের ঘোড়ার উপর ঘুরে চলেচে! অল্পক্ষণ পরেই ললিতা তার ভুল বুঝতে পারলো। ট্যাক্সি, মাথার উপর খোলা আকাশ, পাশে একা সুকুমার!···হাতটা তোলবার চেষ্টা করতেই অনুভব করলে অসহ্য ব্যথা! ললিতা আবার চোখ বুঁজলো।

সুকুমার বললে, খুব কষ্ট হচ্চে ললিতা?

হুঁ···

আর একটু আমরা হাসপাতালের কাছাকাছি এসে পড়েচি।

হাসপাতাল! কেন?·· কেতকী-দি, অনুপমবাবু···

তাঁরা বাড়ী গেছেন। তোমার হাতটা ডাক্তারদের দেখিয়ে আমরাও এখুনি বাড়ী ফিরবো। কোন ভয় নেই তোমার।

হাত কি ভেঙ্গেচে, সুকুমারবাবু?

না, না তবু একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কিন্তু বেশী নাড়াচাড়া করবেন না হাতটা, যেমন আছে তেমনই থাক।

ললিতা আবার আচ্ছন্নের মতো চোখ বুঁজলো। তাব চোখের কোলে হয়তো ক্ষীণ একটি অশ্রুরেখা ছিল, কিন্তু সুকুমার তখন ড্রাইভারকে হাসপাতালের পথ দেখাচ্চে!

এলো তারা হাসপাতালে, সুকুমারের পরিচিত একজন ডাক্তারকে সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল। যথারীতি পরীক্ষা করে তিনি জানালেন যে ভয পাবাব কিছু নেই, দেখে মনে হোলো খুব শক্ত মেয়ে, এটুকু কষ্ট ও সহজেই সহ্য করতে পারবে। তবু সাবধানের মার নেই, একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে দিই।

ললিতার ডান হাতখানা ব্যাণ্ডেজ করে বুকের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হোলো; তার পর ডাক্তার ইঞ্জেকশানও দিলেন।

আসবার সময সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, এক্স-রে পরীক্ষার দরকার হবে কি?

ডাক্তার বললেন, আশা করি নয়। দু' চাব দিনের মধ্যে ব্যথাটা না কমলে খবর দিও, একবার দেখে আসবো।'—একটু আড়ালে নিযে গিয়ে তিনি সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার আত্মীয় তো?

সুকুমার বললে, না, কেউ না, বন্ধু বলতে পারেন।

ডাক্তার একটু বিভ্রতভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললেন: আই সি, আই সি···লেডী ফ্রেণ্ড আর কি!

সুকুমার কিছু বললে না, ললিতাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠ্‌লো।

শীতের রাত্রি, রাত বারটা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে; পথে লোক চলাচল একরকম নেই বললেই হয়। মধ্যে মধ্যে একটা ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার তীরের মতো পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে—হয় তো কার্ণিভাল-ফেরত লোকজন নিয়েই, কে জানে! ললিতা অবসন্নের মতো ট্যাক্সির সীটের কোণ ঘেঁসে বসেছিল--কুণ্ঠায় ও যেন আরও বেশী মুহ্যমান হয়ে পড়েচে! চিরকাল ও নিজে দুঃখ এবং বিড়ম্বনা ভোগ করে এলো এবং যারা তার সম্পর্কে এলো তাদেরও দুর্ভোগের অন্ত রইল না। সুকুমারকে কি করে ও ধন্যবাদ দেবে তাই ললিতা মনে মনে ভাবছিলো; এমন সময় সুকুমারই কথা কইলো।

এখন একটু ভালো বোধ করচেন তো?

বোধ হয়—কেবল মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করচে!

ওটা ইন্‌জেকশানের ক্রিয়া, একটু ঘুমুতে পারলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হোলো কিন্তু—কেতকী-দি বোধ হয় রাগ করবেন!

না, না ··এমন দু একটা ছোটখাট দুর্ঘটনাব জন্য মানুষকে সব সময়েই তৈরী থাকতে হয়। তা ছাড়া অপরাধটা প্রধানতঃ আমাদেরই। আপনি নতুন এসেচেন সহরে, হঠাৎ আপনাকে নিয়ে ওই ছেলেমানুষী করাটা আমাদের উচিত হয় নি···

কিন্তু···আপনার হোষ্টেলে ফিরতে আজ অনেক রাত হবে, বোধ হয় দরজাই খোলা পাবেন না! তা ছাড়া ··

ললিতা কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলো।

বলুন—

ট্যাক্সির দরুণ টাকাটা আপনি জয়ন্তদার কাছে চেয়ে নেবেন। নইলে ভয়ানক অন্যায় হবে আপনার।

আচ্ছা, আচ্ছা…সে বিষয় আপনি মোটেই ভাববেন না, একদিন বিনা কাজে জয়ন্তদার সঙ্গে আপনার বাড়ী চড়াও হয়ে আপনার খাবারে ভাগ বসিয়েছিলুম, আশা করি সে কথাটা এত শিগগির ভুলে যান নি!

ললিতা অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করলো। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটেচে চৌরঙ্গী দিয়ে—কুয়াসার মধ্যেও আকাশের কয়েকটি অস্পষ্ট নক্ষত্র চোখে পড়ে। ললিতা কিছুই ভুলে যায় নি—জয়ন্তদা সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেচে তার কোন কথাই ললিতা ভুলে যায় নি; প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনাগুলির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পর্য্যন্ত তার নিভৃত মনে সযত্নে সঞ্চিত রয়েচে। এখানে এসে তার সমস্ত কাজে, সমস্ত চিন্তায় লেগেচে বিপ্লবের সুর, তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ কিসের স্বপ্নে মেঘমেদুর ও অলস হয়ে এসেচে, নিজের কণ্ঠের ধ্বনি শুনে নিজেরই আজ যেন তার চমক লাগে, তার চারিপাশের সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ যেন রূপে রসে সঞ্জীবিত, বর্ণে, গন্ধে মধুময় হয়ে উঠচে! বাতাস বইচে মধুর করে, মধুমান হয়ে উঠচে সমস্ত পার্থিব ধূলিজঞ্জাল…ভাল লাগচে, ভাল লাগচে তার আপনাকে। কিন্তু এই ভাললাগার ভাগ দেবে ও কা'কে, কে নেবে ওর নবজাগ্রত প্রাণচেতনার ফুলঅঞ্জলি?

বাড়ী পৌঁছে ওরা দেখলো, অনুপম তখনও ফিরে যায় নি, দক্ষিণাবাবু পর্য্যন্ত জেগে ওদের সঙ্গে বসে আছেন!

ট্যাক্সি গেটের মধ্যে ঢুকতেই সবাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

দক্ষিণাবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কি বললেন ডাক্তার—কোন ভয়ের সম্ভাবনা নেই তো?

সুকুমার বললে, না, তবে কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকতে হবে।

—তা হোক, তা হোক···ফ্র্যাক্‌চার যে হয় নি এই ঢের! দেখো দেখি, পরের মেয়েকে ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে কি শাস্তি দেওয়া!

জয়ন্ত বললে, দোষটা সম্পূর্ণ ললিতার, আপনি অকারণ কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আজকালকার দিনে যারা কাঠের ঘোড়ায় চড়তে মূর্চ্ছা যায়, তাদের পথে বার হওয়াই অন্যায়! কিন্তু এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলে মিলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে লাভ নেই দক্ষিণাবাবু, চলুন, ওকে উপরে নিয়ে যাই।

উপরে নিয়ে গিয়ে ললিতাকে বিছানায় শুতে দেওয়া হোলো। জয়ন্ত আর দক্ষিণাবাবু একটু পরেই বিদায় নিলেন। রইলো সুকুমার, অনুপম আর কেতকী।

অনুপম বললে, ললিতা দেবী, অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার; মার্জ্জনার কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে না পেলে, কয়েক দিনের মধ্যে বোধ হয় একটি লাইনও লিখতে পারবো না!—বলুন, অপরাধ নেন নি?

ললিতা শুধু ম্লান একটু হাসলো।

—না, না, অমন চুপ করে থাকলে চলবে না আপনার! স্পষ্ট করে···

কেতকী বললে, স্পষ্ট করে বললেই মার্জ্জনা করা হয় না অনুপমবাবু, কি অপরাধ এমন করেচেন যে তার জন্যে এমন ঘটা করে মার্জ্জনা চাওয়া? জানেন তো রবিঠাকুরের সেই লাইন ক'টা—

মার্জ্জনা করো যদি পাবে তবে বল
করুনা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,

সত্য যা দিয়েছিলে থাক মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশী দিলে
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোন মতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

কেতকীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে : রাইট্—আপনি নইলে এ কথা এমন করে কেউ স্মরণ করিয়ে দিতে পারতো না! 'করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল'—বড় খাঁটী, বড় নিষ্ঠুর সত্যি কথা। আমিও তো সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অত স্পষ্ট করে—গুছিয়ে বলতে পারিনি। জানেন, শ্রীমতী কেতকী—এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমার মনে হযেচে যে আমরা—অর্থাৎ এই আজ-কালকার কবিরা অনেক সাধ্যসাধনা করে কবিতায় যে সমস্ত নতুন কথা আমদানি করবার চেষ্টা করচি, তার সবই তিনি আমাদের অনেক আগে লিখে ফেলেচেন। দৈবাৎ আগে জন্মে তিনি আমাদের কি ঠকানই ঠকিয়েচেন, সে কথা ভেবে অনেক সময় আমার রীতিমত ক্রোধ হয়েচে!

অনুপমের কথার ভঙ্গিতে ঘরের আবহাওয়া যেন একটু হালকা হয়ে উঠলো—হেসে উঠলো সবাই, ললিতা পর্য্যন্ত!

অনুপম হঠাৎ তার কব্জি-ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, না, রাত প্রায় একটা হোলো—এবার আমায় উঠতে হবে! সুকুমারবাবু বোধ হয়···

সুকুমার বললে, না, না, চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাক, কারণ আমরা দুজনেই আসামীর দলে।

কেতকীর দিকে চেয়ে বললে : আজকের মতো এইখানেই পালা শেষ করা যাক। তোমরা দুজনে শুয়ে পড়ো, রাত করো না আর কাল সকালে এসে ললিতার সম্বন্ধে খোঁজ নেব—

বারান্দায় অনুপম আর সুকুমারের ছায়া এবং পদধ্বনি মিলিয়ে গেল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, লীলা-দি ফেরেন নি বুঝি এখনও—?

না।

খাওয়া হয়েচে আপনার ?

না।

খাবেন না—?

উঁহু—শরীরটা ভাল লাগচে না তেমন।

রাগ করলেন না তো আমার ওপর ?

কেন ?

এত কষ্ট দিলুম সবাইকে—সুকুমারবাবু এই শীতের রাত্রে···

কেতকী তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে। বললে, রাত করে হোষ্টেলে ফেরা ওর পক্ষে নতুন নয়।

কিন্তু খাবেন না কেন ?

এমনি ··রাত অনেক হয়েচে ; একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো ললিতা।

কেতকী রাগটা টেনে গায়ে দিলো। আর ললিতা ? কেতকীর এই বিচিত্র আচরণের কিছুই সে বুঝলো না, যে পথ দিয়ে অনুপম এবং সুকুমার কিছুক্ষণ আগে নিচে নেমে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

সকালে চায়ের টেবলে কেতকীর মুখের দিকে চেয়ে লীলা বিস্মিত হোলো। সুধাংশুর সঙ্গে তার নব অভিযানেব পরিচয দেবাব জন্য তৈরী হয়ে একটু বেশী রাত্রিতে ও বাড়ী ফিরেছিলো—কিন্তু বাড়ী পৌঁছে যখন শুনলো, ললিতা কার্ণিভ্যালে গিয়ে হাত ভেঙে এসেচে, সুকুমার এবং অনুপমবাবু রাত একটা পর্য্যন্ত এখানে ছিলেন, তখন স্বভাবতঃ ওর লজ্জা

হবার কথা। চুপিচুপি ঘরে গিয়ে ও শুয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সকালে উঠে কেতকীর মুখে বিষাদের একটী অনির্দ্দেশ্য ছায়া দেখবার জন্য ও মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে ভয়ে লীলা জিজ্ঞাসা করলো, মুখ এত গম্ভীর কেন রে?

কেতকী সে কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে: কাল কত রাত্রিতে ফেরা হোলো শুনি?

প্রায় দুটো—সুধাংশু ছাড়লে না কিছুতেই—ওর সঙ্গে যেতে হোলো ক্যাসানোভায়।

কেতকী শুধু বললে, ভাল!

কিন্তু তোমার খবরটা শুনি? হঠাৎ এমন মুখ অন্ধকার করে বসে আছো যে?

কেতকী বললে, তোর ওপর হিংসে, এটুকু আর বুঝতে পারলি না?

এখনও পারিনি। কিন্তু কারণটা?—সুধাংশু নয় তো?

'আশ্চর্য্য কি!'—বলে কেতকী হাসবার চেষ্টা করলো।

লীলা কিন্তু এত সহজে ভোলবার মেয়ে নয়; বললে: তোমার মনের জাহাজখানি কোন্ ঘাটে নোঙর ফেলেচে সে কথা এ বাড়ীতে জানতে কারও বাকি নেই। বেচারি সুধাংশু তোমার গণ্ডীর বাইরে। আসল খবরটা শুনি।

'কিছুই না, এমনি—' কেতকী বললে।

সামনের বাগান থেকে সকালের কুয়াসা তখনও নিঃশেষে মরে যায়নি। ভীরু সুগন্ধ ভেসে আসচে লনের ওপার থেকে। কেতকী চুপ করে চেয়ে রইলো।

লীলা বললে, সুকুমারবাবুর সঙ্গে আর এক দফা ঝগড়া করলে না কি?

উঁহু। করতে পারলে হোতো—

শুধু শুধু?

মন্দ কি··· মাঝে মাঝে তোরও কি ইচ্ছে যায় না?

যায়। কেবল সে ইচ্ছেটুকু কাজে খাটাবার লোক খুঁজে পাইনে। যাক, আসল কথাটা তুই ভাঙ্গবি না, এটুকু এতক্ষণে বোঝা গেল। আয় ললিতাকে একবার দেখে আসি।

আমি সমস্ত রাত্তির ছিলাম ভাই—তুই গিয়ে দেখে আয় না, বোন তো আমার নয়, তোমাদেরই—

কেতকী উঠে দক্ষিণাবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। লীলা উঠলো উপরে·

ললিতা অবসন্নের মতো বালিসে ভর দিয়ে বসেছিল, পাশের চেয়ারে জয়ন্ত। লীলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে জয়ন্ত বললে, আয়, কতকগুলো দরকারি কথা তোদের বলে যাওয়া দরকার।

—কেন, তুমি কি আজই চললে নাকি দাদা?

—ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হবে। পশ্চিমের সেই কাঠখোট্টা জীবনের চেয়ে এখানকার আবহাওয়াটা এক রকম ভালই লাগছিল। কিন্তু কালকেই সমন এসেচে, লায়ালপুরে সোস্যালিষ্টদের একটা বৈঠক আছে; সভাপতি করেচে আমাকে। সুতরাং ছুটী ফুরোবার আগেই ছুটতে হবে ওদের মন রাখতে। যাক ও কথা। তোর কলেজ খুলচে কবে?

—নিউইয়ার্স ডে'র পরেই।

—তারপর হোষ্টেলে নিশ্চয়ই? কিন্তু ললিতা আপাততঃ এইখানেই থাকবে, কাল দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করেচি। উপস্থিত, তোমাকে আর ললিতাকে হোষ্টেলে রেখে খরচা চালাতে পারবো,

এমন ভরসা নেই। দক্ষিণাবাবুকে সব খুলেই বললাম। মাত্র দুশো টাকা মাইনে পাই এবং তা থেকে তোর হোষ্টেলের এবং কলেজের খরচা বাবদ প্রায় একশো টাকা বেরিয়ে যায় এবং বাকী টাকাটা যায় বাবার দেনা শোধ করতে—শুনে উনি বললেন, ললিতার থাকার দরুণ আমি একটী পয়সা কিন্তু নিতে পারবো না জয়ন্ত!' অনেক কষ্টে তাঁকে সামান্য কয়েকটা টাকা নিতে রাজী করানো গেছে। এখন কথা এই যে, ললিতা উপস্থিত রইলো বটে এইখানেই এবং এখান থেকেই ও ইস্কুলে যাবে আসবে —কিন্তু ঠিক এঁদের সঙ্গে ও মানিয়ে চলতে পারবে কি না, সে সম্বন্ধে তোমাব খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

লীলা বললে, খোঁজ নিতে আমার এমন কি পরিশ্রম হবে দাদা? কিন্তু ললিতা লেখাপড়া শিখে কি করবে বলো তো—কতদূরই বা পড়বে?

—যতদূর পারে। যার ভূপ্রদক্ষিণ করবার সামর্থ্য নেই, সে ঘরের বাইরে যাবে না, এমন কথা তোর কাছে আশা করিনি। ওটা দরকার—ওতে চারিদিকে নিজের চোখ দিয়ে দেখা যায়।

অত্যন্ত বেশী-করে দেখতে শিখচি বলে পৃথিবীতে অশান্তি একটু বেশী মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েচে।

—হয় তো। কিন্তু আজ আর তার হাত এড়াবার উপায় নেই। থাকবো বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়ে, ভাববো পুরাণের যুগের লোকদেব মতো—এ আমার সহ্য হয় না। সভ্যতার দাম আমাদের সবাইকে দিতে হবে। হয়তো কোথাও কোথাও সে দাম একটু বেশী, কিন্তু তা থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায়?

—ওদের মানুষগুলোকে দেখেচো দাদা, কি বিস্তীর্ণ পরিসর ওদের জীবনের, চিন্তার পথ কত প্রশস্ত! কিন্তু Los Angels কি Moscowর

ডাইভোর্স কোর্টের মামলাগুলো পড়ে মাঝে মাঝে ভয় লেগে যায়—এত বেশী চিন্তার স্বাধীনতা হয় তো আমাদের ভাল নয়!

—আমরা আশা করি, সভ্যতার এই বিকৃতি একদিন সহজ হবে; আজকে জল উঠেচে ঘুলিয়ে—বন্যার জল। নানা জঞ্জাল ভেসে চলেচে সেই স্রোতে। কোনদিন সে কি স্বচ্ছ হবে না?

—ততদিন মানুষ এমনি করে নিজেদের বলি দেবে?

—পুরানো সভ্যতাও অনেক বলি নিয়েচে লীলা। এই বাংলা দেশেই কত মেয়ে হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে থাইসিসে কাবার হয়ে গেছে—পুরান প্রথার দোহাই দিয়ে এতকাল আমরা তাদের রান্না ঘরের বাইরে টেনে আনবার সাহস করিনি। তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে না? কিন্তু তোর মুখে আজ এসব কথা কেন বলতো? তুই এত কথা ভাবতে পারিস, এ কথা এতদিন জানতাম না। তা ছাড়া, তোকে এতকাল আমার বোনের মতো বোন বলেই জানতাম—যাকে বলে ultra modern. কিন্তু আজ তোকে দেখে ভয় লাগচে। মনে মনে বুড়ী হয়ে উঠলি কবে?

লীলা অদ্ভুতভাবে হাসলে একটু, তারপর বললে: আমার এ সব কথা কিন্তু বই পড়ে শেখা নয় দাদা, মোটেই না। আমি নিজে ভেবেচি এর প্রত্যেকটি কথা।

—আরও অনেকে আজ ঠিক এই কথাই ভাবচে, কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্চে না। হয় তো একদিন পথ মিলবে খুঁজে কিম্বা মিলবে না। কিন্তু তুই আমায় নতুন করে ভাবালি লীলা। আজ আর সময় নেই তর্ক করবার। ট্রেণে যেতে যেতে ভেবে দেখবো তোর কথাগুলো আরও ভাল করে, কিন্তু তুই এত কথা ভাববার সুযোগ পেলি কবে? ভারি আশ্চর্য্য লাগচে আমার!

লীলা হাসতে হাসতে ঘর থেকে উঠে যাবার চেষ্টা করছিলো, এমন সময় প্রবেশ অনুপম এবং সুকুমারের। অনুপম আর একবার তার কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললে : এখন একটু ভাল আছেন তো ?

ললিতা একটু হেসে ঘাড় নাড়লো।

সুকুমার এসে দাঁড়াল বিছানার কাছে। বললে : হাতের ব্যথাটা কেমন বোধ করচেন, একটু কম নিশ্চয়ই ?

ললিতা এবার কথা বললে : দু একদিনের মধ্যেই সেরে উঠবো বোধ হয়। আপনার কাল হোষ্টেলে ফিরতে কোন অসুবিধে হয় নি তো ?

না, না, চাকর-বাকরগুলো আমার জন্যে এক রকম তৈরী হয়েই থাকে।

এবার জয়ন্ত সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে, 'আজ রাত্রিতে চলতি, সে খবরটা শুনে রাখো ভাই। ললিতা যে ক'দিন বেশ সেরে না উঠচে, সে ক'দিন তুমি একটু খোঁজ খবর নিও। আর কেতকী তো আছেই—' বলেই জয়ন্ত যেন এতক্ষণে আবিষ্কার করলো যে কেতকী ঘরের মধ্যে নেই! ব্যস্ত হয়ে বললে : আচ্ছা, সে মেয়েটা কোথায় বল তো লীলা? সকাল থেকে তার যে দেখাই নেই। ওদের বাড়ীটা ক্রমশঃ সরকারী গেষ্ট-হাউসে দাঁড়াচ্চে দেখে রাগ করলে নাকি আমাদের উপর ?

সুকুমার বললে, না, না, কি যে আপনি বলেন জয়ন্তদা! আসবার সময় দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে ; বললে, কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নি, একেবারে স্নান সেরেই উপরে আসবে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠেছিল, আবার চেয়ারটা দখল করে বললে : যাক,

এতক্ষণে আশ্বস্ত হওয়া গেল। Report from our own correspondent—এ আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। আমরা তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি, সুকুমার?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার কলেজ খুলতে এখনও অনেক দেরী, এরি মধ্যে যাবার তাগাদা কেন?

—সাদা বাংলায় একটু গলার কসরৎ করতে, ইংরিজীতে 'to preside over a Conference'—

—তবু যাওয়াটা আপনার দরকার?

—নিশ্চয়ই, কারণ বক্তৃতার চেয়ে রোমাঞ্চকর কাজ এখানে ঘোরতর বে-আইনী। উপরন্তু হাততালির মোহটা বড় ভয়ানক হে!

—আপনি ঠাট্টা করচেন। কিন্তু ললিতা সেরে উঠলেই বোধ হয়—

—বোধ হয় নয়, ও নিশ্চয়ই সেরে উঠবে এটুকু তুমি ধরে নিতে পারো সুকুমার। আমাদের দেশের মেয়েরা এত সহজে বেশী দিন বিছানায় পড়ে থাকে না। কিন্তু ললিতার কথা উপস্থিত মুলতুবী থাকতে পারে। তোমাদের শুভলগ্নের ঘোষণা যেদিন আমার লাহোরের ঠিকানায় পৌছবে, সেইদিনই আমি ছুটীর জন্য দরখাস্ত করবো, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। দরকার হলে বিবাহ-সভায় marriage and its utility সম্বন্ধে সারগর্ভ একটা বক্তৃতা দিতেও আমার বাধবে না—যদিও আমি ও বস্তু সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই রাখি নে। কিন্তু তার জন্যে আটকাবে না, আমি স্পীকার by profession এবং যে বিষয়ে অভিজ্ঞতার বালাই থাকে না, সেই বিষয়ে বক্তৃতা করা যে বেশী সহজ, সে তো তোমরা এ দেশে প্রতিনিয়ত দেখচো!

এমনি করে আলোচনা এবং আলাপে শীতের সকালবেলাটি ক্রমশঃ উপভোগ্য হয়ে উঠছিলো। কিন্তু ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পরেও কেতকী উপরে এলো না।

জয়ন্ত বললে, কেতকী তো এখনও এলো না, ব্যাপার কি বলো তো সুকুমার? দুজনে আবার ঝগড়া করেচো বুঝি? সময় থাকতে খবর দাও, দেখি যদি আবার তোমাদের—

সুকুমার বললে, না, না, আমি তো জেনে শুনে দু-চার দিনের মধ্যে ওঁর সঙ্গে কোন রকম···

জয়ন্ত বললে, তা হলে নাচার! একে তো আমায় নারী সম্বন্ধে এক রকম আনাড়ী বললেই হয়, তার ওপর কল্পনাশক্তির দৈন্য একটু বেশী রকম। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হয়ে লাগেজ গুছোতে পারি।

অনুপম বললে, তা পারেন। কিন্তু যাবার আগে আমার একটি কৌতূহল আপনাকে চরিতার্থ করে যেতে হবে।

—'আজ্ঞা করুন'—জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে।

—পাঞ্জাবের সেই শিখ ও খোট্টাদের মধ্যে কেমন করে দিন কাটে আপনার? মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ একটু কম, সে কথা আপনার মুখেই শুনলাম। কিন্তু শুধু সোশ্যালিজমের থিওরী মানুষের মনকে কতদিন তাজা রাখতে পারে বলুন তো?

—শুধু সোশ্যালিজমের থিওরি এই বা ধরে নিচ্চেন কেন? এমনও তো হতে পারে যে আমার মনকে তাজা রাখবার মতো রসদের অভাব নেই!

—রসদের সেই ভাঁড়ারের রহস্যই তো জানতে চাই আপনার কাছে।

—তা হলে আর যাই হোক, তার রহস্যটুকু মাটী হয়ে যাবে।

অর্থাৎ ও সম্বন্ধে অভ্যাস আমার সঞ্চয়ের, বিতরণের নয়। তা ছাড়া ছোট বোনের দল ভিড় করে রয়েচে চার পাশে, আর, সবিস্তার প্রেমের গল্প বলবার বয়স এখন নেই।

সুকুমার বললে, শোনবার বয়স কিন্তু এখনও আপনার যায় নি!

জয়ন্ত বললে, ভাল অভিনেতার মতো ভাল শ্রোতারও প্রয়োজন আছে, একথা ভুলে যেও না।

সুকুমাব বললে, মোটেই না। কিন্তু অভিনেতা আপনিও একদিন ছিলেন, এখবর অন্ততঃ আমি জানি।

অনুপম উচ্ছ্বসিত হযে বললে, সুকুমারবাবু বলুন তো সেই খবরটা, দোহাই আপনার···

জযন্ত বললে, তা হলে আমিই বলি--to save your trouble, Sukumar. দিন কযেক আগে সুকুমারকে নিয়ে বাঁকড়োয গিয়েছিলাম। পথে আমাব মণিব্যাগটা একবাব ওব হাতে গিযে পড়েছিল—কিন্তু টাকার থলেব মধ্যে থেকে সুকুমার হৃদযের রহস্য উদ্‌ঘাটন করলে—কলম্বাস সুকুমার!

কি রকম? কি রকম?—অনুপমের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

মণিব্যাগের মধ্যে ছিল একখানা ছবি—অস্পষ্ট, পুরাণ। ছবিটী কোন মেযেব।

তারপর? তারপর?

এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই। যদি থাকে তা সুকুমারের কল্পনায়। সেদিন সুকুমার সাহস করে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নি, এতদিনে আজ তার মুখ ফুটেচে। ওই শেষ করুক গল্পটা।

অর্থাৎ আপনি নিজে কিছু বলবেন না এ সম্বন্ধে ?

ভয় আছে, অনুপমবাবু যদি আমাদের সেই গল্পটাকে কবিতার মধ্যে টেনে এনে কাগজে ছাপিয়ে দেন। কিন্তু, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নয় সুকুমার। প্রেম সম্বন্ধে যাদের বিশ্বাস আছে তারা প্রেম করুক, আমায় তা'র মধ্যে টেনো না। আমি এখুনি একবার কল্‌কাতায় যাব— নিউম্যানের বাড়ী। খানকয়েক বই কেনা দরকার।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনুপম লীলার দিকে চেয়ে বললে, রাগ করবেন না—আপনার দাদাটিকে দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে।

লীলা হাসতে হাসতে বললে, আমি নিজেও কম আশ্চর্য্য হই না, সুতরাং আপনার ওপর রাগ করবো কেন ? কিন্তু পরের গল্প শোনবার লোভ যার এত বেশী, তার নিজের গল্পটাই যে আমাদের এখনও শোনা হয় নি !

অনুপম বললে, এখনও গল্প সুরু হয় নি। অর্থাৎ এটা আমার জীবনের কবিতার যুগ, মুহূর্ত্তগুলিকে আমি উপভোগ করে চলেচি। কখনও হোটেলের কোন নির্জ্জন কামরায়, কখনও বাস বা ট্রামের পথে ক্ষণ-বন্ধুত্ব দিয়ে জীবনকে কবিতার মতো করে দেখছি।

> আইসক্রিমের পেয়ালাটি হাতে, বাঁকায়ে ভুরু,
> সিনেমায় কোন্ চিকণ মেয়ে
> ইণ্টারভাল্ আলো করেছিল হঠাৎ করে
> মোর মুখপানে ক্ষণেক চেয়ে।

তাই নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস আর আতিশয্য ! যেদিন এই ছোটখাট জিনিসগুলোর লোভ ঘুচবে, মুহূর্ত্তগুলোকে ভুলে পৌছব প্রহর আর

ঘণ্টার হিসেবে, সেইদিন থেকে গল্প সুরু হবে। অপেক্ষা করতে পারবেন তো ততদিন?

হয়তো খুব বেশী দিন নাও হোতে পারে!

ভবিষ্যদ্বাণী নয় তো?

আশ্চর্য্য কি—অতি সাবধানীদের বিপদ ঘটে অতি-অকস্মাৎ!

অনুপম হাসতে হাসতে বললে, ঘটুক বিপদ, সফল হোক আপনার ভবিষ্যদ্বাণী; আপনার দাদার মতো কিছু সঞ্চয় করি মনের ভাণ্ডারে। আমি প্রস্তুত।

সুকুমার নিঃশব্দে ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে এলো—চেয়ে চেয়ে দেখলো চারিদিকে, কিন্তু কেতকীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সুকুমার নিচে নেমে এলো। এদিকেও কেতকীকে পাওয়া গেল না। অগত্যা সুকুমার কেতকীর পড়বার ঘরের দিকে এগুলো। কেতকীকে শেষ পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যেই পাওয়া গেল। কিন্তু কেতকী স্নান করে নি, ঠিক সেই সকাল বেলাকার মতো এলোমেলো এক-মাথা রুখু চুল নিয়ে, আরাম কেদারায় বসে অন্যমনস্কের মতো বইয়ের পাতা উল্টে চলেচে!

সুকুমার ঘরে ঢুকলো, কেতকী তবু বইয়ের পাতা থেকে মুখ তোলবার চেষ্টা করলে না।

সুকুমার আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘড়ির মৃদু হার্ট-বিট্ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না! সুকুমার লক্ষ্য করলো, কেতকীর দুই চোখের কোলে অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেচে—মেঘ এসেচে ঘনিয়ে, বর্ষণ সুরু হোলো বলে!

সুকুমার স্বভাবতঃ একটু মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির। তবু এখন আর সে চুপ করে থাকতে পারলো না। চেয়ারটী কেতকীর কাছাকাছি টেনে নিয়ে গিয়ে শুধাল : কি হোল কেতকী ?

'কিচ্ছুই না'—কেতকী তেমনি অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিলে।

ওকথা আমি শুনবো না। সকাল থেকে তুমি আমায় এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করচো। কি হয়েচে তোমার ?

কেতকী এবার কোন কথাই বললে না। কিন্তু তার দিকে চেয়ে স্পষ্ট বোঝা গেল যে মনে মনে ও ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করচে, কেৎলির মধ্যে জল ফুটচে টগবগ করে, ঢাকা খোলবার অপেক্ষা শুধু !

সুকুমার বললে, তোমাদের ড্রয়িংরুমে আমি একদম বেমানান, মুখ ফুটে কথা বলতে পারি নে, যে বিষয় জানি নে, সে নিয়ে অকারণ তর্ক করতে আমার বাধে ; এগুলো আমার অপরাধ সে কথা আমি জানি। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি অত্যন্ত সহজ। তোমাকে ভালবাসি বলে তোমাকেও তেমনি সহজ করে জানতে চাই। কিন্তু আজও তুমি সেই প্রথম দিনের মতো নিজেকে কতো দূরে সরিয়ে রেখেচো! কখনও তুমি অন্তরঙ্গতায় একেবারে মুখর হয়ে ওঠো, কখনও একেবারে আমার উপলব্ধির বাইরে চলে যাও। আজ সব কথা তোমার কাছে শুনবো।

'আমার বলবার কিছু নেই'—কেতকী বললে।

অর্থাৎ এতদিনের এই আলাপ এবং পরিচয়, এর কোন মানেই হয় না!

আমি সে কথা তোমায় বলি নি।

সব কথা বলতে হয় না কেতকী।

ঘরের মধ্যে আবার সেই অপ্রীতিকর স্তব্ধতা। সুকুমার রীতিমত বিপন্ন বোধ করতে লাগলো। এর পর কি বলবে সুকুমার? শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল এই ক'মিনিটের মধ্যে? কেতকী যে কোনদিন তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে কথা বলেচে, এ কথা আজ আর ওর দিকে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই। ওর মুখের উপর কি আশ্চর্য্য নির্লিপ্ততা!

সুকুমার উঠে দাঁড়াল।

— চললাম কেতকী, কলেজের বেলা হচ্চে।

এসো।

সুকুমার দরজার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু ফিরে এলো তখনই।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে নিশ্চয়ই তুমি আজ দুঃখিত?

সে কথা তোমায় বলিনি।

কিন্তু আর কোন কথা বলাও তুমি দরকার মনে করো নি। বোধ হয় তা নেইও।

কেতকী এতক্ষণে হাসলো—ভারি অদ্ভুত সেই হাসি; সুকুমারের পক্ষে তার অর্থ নির্ণয় করা সহজ নয়। উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললে, এতকাল তোমাদের মধ্যে শুধু হাসির খোরাক জুগিয়ে এসেচি, এতদিনে সে কথা বুঝতে পারলাম। আর জের টেনে লাভ নেই। আমি উঠলাম কেতকী।

সুকুমার এবার সত্যিই ঘরের চৌকাঠ পার হোলো। কিন্তু কেতকী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পাগলামি করো না, ঘরে এসে বসো।

তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে সুকুমার বিস্মিত হোলো। বললে, কেন? মোনালিসার মতো অদ্ভুত করে আর একবার হাসবে বলে?

কেতকী হাসতে হাসতে বললে, ক্ষতি কি, এতদিন তো এই হাসিই তোমার ভাল লাগতো।

সুকুমার এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, না, কেতকী, তোমার ঠাট্টাগুলো সত্যিই এবার কঠিন হয়ে উঠেচে।

ঠাট্টাও করবো না তোমার সঙ্গে?

না।

তবে কি তোমায় দেখলেই 'মহিম্ন-স্তব' পড়তে সুরু করে দেব?

সে কথা আমি বলিনি। কিন্তু কাজের কথা যদি কিছু থাকে, সেইটেই বলো।

এতকাল তো কাজের ফর্দ্দ নিয়ে এখানে আসোনি।

সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

সত্যি ভালো। আমিও সেই কথা তোমায় বলবো ভাবছিলাম।

কেন?

তুমি সত্যি ছেলেমানুষ।

বয়স তো সত্যি খুব বেশী হয় নি, অকাল বার্দ্ধক্যের উপাসনা নাই করলাম।

কাল থেকে এমন কিছু কি ঘটেনি যার জন্যে আমি রাগ করতে পারি?

আমার তো মনে পড়ে না।

ভেবে দেখো।

সুকুমার ভাবতে লাগলো,···কিন্তু না, কিছুই তার মনে পড়ে না। বোকার মত কিছুক্ষণ বসে রইলো, তারপর বললে: সত্যিই আমি কিছু মনে করতে পারচি না কেতকী। তুমিই বলো না···

কেতকী একেবারে স্থকুমারের কাছে এসে দাঁড়াল। স্থকুমারের পকেট থেকে টর্পোডোর মতো চেহারার ঝরণা-কলমটা তুলে নিয়ে অকারণে একবার নাড়াচাড়া করলো ; তারপর স্থকুমারের চোখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমরা দু'জনেই ভারি ছেলেমানুষ, সত্যি !

বেলা চারটের গাড়ীতে জয়ন্তর যাবার পালা। বিছানাপত্র সব বাঁধা হয়েচে, দক্ষিণাবুর মোটরখানাও ষ্টেশনে যাবার জন্য তৈরী। উপর থেকে হঠাৎ লীলা বললে, ললিতা তোমায় ডাকচে দাদা !

—আমাকে ? হঠাৎ কেন বলতো ?

বলতে বলতে জয়ন্ত উপরে উঠে গেল। বিছানায় বসে ললিতা কি একখানা ছবির বই দেখছিল। জয়ন্ত এসে ঘরে ঢুকতেই ললিতা মুখ তুলে চাইলো। রুখু চুলগুলি ললিতার ক্লান্ত মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, ভারি করুণ মনে হচ্চে ললিতাকে !

—যাবার সময় হঠাৎ পিছু ডাক কেন বে ?'—জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলো।

ললিতা কিন্তু হঠাৎ কিছুই বলতে পারলে না। তার ঠোঁটের প্রান্ত একবার কেঁপে উঠলো, মনে হোলো কিছু বলবে, কিন্তু তারপরেই মুখ নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

—যাবার সময় তোরা একটা গোলযোগ না বাধিয়ে থাকবি নে, এ আমি বরাবর দেখে আসচি। কি হোলো বল্ শুনি···

বলতে বলতে জয়ন্ত ললিতার কাছে এসে বসলো। কিন্তু ললিতা ঠিক তেমনি নিঃশব্দে বসে, কথা বলবার কোন উৎসাহই তার মধ্যে নেই···

জয়ন্ত আবার বললে, আমি চলে যাচ্চি বলে তোর তো কোন অসুবিধা

হবার কথা নয় ললিতা। লীলা প্রায়ই এসে তোর খোঁজ নেবে। তা ছাড়া এঁরা সবাই অত্যন্ত ভাল লোক…

এবার ললিতা কথা বললে; বললে: সে জন্যে আমি ভাবিনি জয়ন্তদা, কিন্তু এখানে আমার ভাল লাগচে না…

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, কেন বলতো…কি হোলো এখানে?

ললিতা আবার চুপ করে রইলো; তারপর বললে: ভাল লাগচে না বললে হয়তো ভুল বলা হবে জয়ন্তদা, শুনতেও সেটা ভারি খারাপ। কিন্তু ··সত্যি জয়ন্তদা, এখানে থাকতে আমি যেন মনে মনে সাহস খুঁজে পাচ্চি না, কেবলই মনে হচ্চে…

—কি মনে হচ্চে? জয়ন্ত জানতে চাইলো।

—সে কথা তুমি বুঝবে না জয়ন্তদা; এখানে হয়তো বড় বেশী ভালো আছি—এত বেশী ভালো থাকাটাও বোধ হয় আমার পক্ষে উচিত নয়।

জয়ন্ত এবার হো হো করে হেসে উঠলো, বললে: যাক্ তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি ভাবছিলাম, সত্যিই বুঝি কিছু…

কেন যে ললিতার মত শান্ত, সংযত, আত্ম-সমাহিত মেয়ের মুখ দিয়ে হঠাৎ আজ এতগুলি কথা বেরিয়ে এলো জয়ন্ত তা ভাবতেই পাবে নি; ওর হঠাৎ চলে যাওয়াটাই যে ললিতার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ, সে বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত হোলো। ললিতার এলোমেলো বিপর্য্যস্ত চুলগুলির উপর সস্নেহে হাত রেখে জয়ন্ত বললে, এঁদের মতো মানুষ আমি খুব কম দেখেছি ললিতা, সেই জন্যেই তো সাহস করে তোকে এইখানে রেখে যেতে পারলাম। তবু যদি হঠাৎ দরকার পড়ে, খবর একটা পাঠাস, ফিরে আসতে আমার বেশী সময় লাগবে না।

জয়ন্ত আর সেখানে অপেক্ষা করলো না, দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সময় আর বেশী নেই। দক্ষিণাবাবুকে নমস্কার জানিয়ে উঠে বসলো গাড়ীতে, তারপর কেতকীর দিকে চেয়ে বললে, আশা করচি এবার আসবো একেবারে হলুদ রঙের খাম পকেটে নিয়ে এবং পাঞ্জাবী ডাল-রুটীর কৃপায় এই ক'দিনে পেটের যে দুরবস্থা হবে তা'র ক্ষতিপূরণ করে নিতে খুব বেশী দেরী হবে না।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাটে আমরা সুধাংশু মিত্রকে দেখতে পেলাম।

বিকাল বেলার অবসন্ন আলো এসে পড়েচে তার পশ্চিম-মুখী ঘরের সামনে। বারান্দায় এলোমেলো ভাবে গোটা কয়েক বেতের চেয়ার পাতা, সামনের টিপয়ের ওপর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসচে। সুধাংশুর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। 'ন্যাশ' ম্যাগাজিনের রোমাঞ্চকর একটা গল্পের মধ্যে ও একেবারে ডুবে গিয়েছে!

কলিং বেল্ বেজে ওঠবার শব্দে সুধাংশু বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতে বেয়ারাটা এসে জানাল, কোন ভদ্র মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। সুধাংশুও ড্রেসিং টেবেলের সামনে গিয়ে রূপো-বাঁধান ব্রাস দিয়ে চুলগুলো একটু মার্জ্জিত করে নিলো, তারপর বেয়ারাকে বললে, উপরে নিয়ে আয়।

উপস্থিত সুধাংশুর জীবনে লীলা ছাড়া আর সব মেয়ের প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং লীলা ভিন্ন আর কেউ যে এমন সময় আসতে পারে না, তা কল্পনা করে নেওয়া ওর পক্ষে কঠিন হোলো না। কয়েক মিনিট পরে লীলাই এসে দাঁড়াল তার সামনে।

হ্যারিংটন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে লীলার এই প্রথম পদার্পণ। সুধাংশু স্মিত হাস্যে লীলাকে সম্বর্দ্ধনা করে বললে: কি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলুন তো, বিনা আহ্বানে এখানে আপনার দেখা পাব, এ যে ভাবতেও পারি নি!

লীলা বললে, দাদা হঠাৎ লাহোর চলে গেলেন, কলেজ খুলতেও এখনও ক'দিন বাকি। কি করা যায় ঠিক করতে না পেরে সোজা এইখানে চলে এলাম।

সুধাংশু বললে, মনে মনে যথেষ্ট অপ্রস্তুত বোধ করচি, কারণ, বাইরে আমাকে যে-ভাবে দেখেচেন তার সঙ্গে এখানে হয়তো অনেক গরমিল চোখে পড়বে। বাইরে যতখানি পারিপাট্য, এখানে দেখবেন ঠিক ততখানি বিশৃঙ্খলা। তবু খুশী যে হইনি, এমন কথা বলবো না। তাতে মিথ্যে বলা হবে। পরিচয়ের সম্পূর্ণতার পক্ষে আপনার এমনি হঠাৎ আবির্ভাবের বুঝি প্রয়োজন ছিল।

আসন্ন সূর্য্যাস্তের রঙীন আলো এসে পড়েছিল লীলার মুখের উপর। সে আলোয় লীলার সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন হঠাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তার দীর্ঘ দেহ, হাই-হিল্ জুতো, ফিকে সবুজ রঙের হাত-ঢাকা পশমী জামা, হাতের ভ্যানিটী কেস, সব কিছু তার প্রখর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।

সুধাংশু বিহ্বল কণ্ঠে বললে: বসুন।

দুজনে পাশাপাশি দু-খানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

লীলা জিজ্ঞাসা করলে, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—একাই থাকেন বুঝি এখানে?

—ঠিক একা নয়; একজন খানসামা, ভুটানী একটা চাকর আর আমি নিজে।

—শুধু নিজের জন্য এত বড় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন, এর খরচও তো কম নয় সুধাংশুবাবু ?

—এদিকে খরচ অবশ্য একটু বেশী, কিন্তু ফ্ল্যাটের জন্য আমার কোন খরচ নেই। বাড়ীটা আমাদেরই। এই অংশটুকু নিজের জন্য রেখে সমস্তটা ভাড়া দিয়ে দিয়েচি।

—ভালই করেচেন। শুনেচি, আপনার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ এখানে নেই,···কতকাল কাটাবেন এমনি ভাবে ?

—যতদিন চলে।

আবার দুজনে কিছুকাল চুপ করে বসে রইলো। অপরাহ্নের আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ, অবসন্ন হয়ে আসচে। লীলা হঠাৎ, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন, আপনার ঘরগুলো দেখে আসি।

—চলুন, কিন্তু লোকসমাজে যেন আমার ঘরের হতশ্রী অবস্থাটা প্রচার করবেন না

—ভয় নেই আপনার, চলুন।

পাশাপাশি দুখানি ঘর, একটী বেশ বড়, আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট। বড়টি সুধাংশুর শোবার ঘর, ছোটটিতে বসে' ও পড়াশুনো করে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার হিসেবে দুটিই সমান। শোবার ঘরে পৌঁছে লীলা দেখলো, একরাশ পরিত্যক্ত জামা-কাপড় ঘরের এককোণে জমা হয়ে আছে এবং আনলার উপর ফরসা জামা-কাপড়ের ভিড়ও অল্প নয়। ছোট খাটখানাব উপর ক্ষৌরকর্ম্মের সরঞ্জাম থেকে খানকয়েক সস্তা ইংরজী গল্পের বই। জানালার পাশেই সৌখীন একটা আলমারি, ডালাটা সম্ভবতঃ বন্ধ করা হয়নি—চাবির গোছা ঝুলচে সেইটের গায়ে। খাটের পাশে ছোট একটী টিপয়—তার উপর ফুলদানিতে শুকনো একরাশ 'য়্যামোরাস পিল !'

পড়বার ঘরে বইগুলো সব এলো মেলো করে চারিদিকে ছড়ানো ; বইগুলির জন্যে প্রকাণ্ড একটা র‍্যাক অবশ্য ঘরের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই স্থানচ্যুত হয়ে টেবলটার উপর ভিড় করেচে। সেগুলির মধ্যে স্যানাটোজনের একটা শিশি—খানিকটা এখনও আছে, গো টা চারেক পার্কার-শেফার-পেলিক্যান কলম, সিনেমার প্রোগ্রাম সম্বলিত দু'একখানি বই, খানকয়েক উড্-কাট, মিনেকরা একটা য়্যাসট্রে, সিগারেটের কৌটা গোটা দুই···

লীলা চারিদিক ঘুরে এসে বললে, আপনাব চাকরগুলোও তো খুব সাবধানী দেখচি।

কেন বলুন তো ?

—কিছুই যথাস্থানে রাখবার দরকার মনে করে না। এমন কি চাবিটা পর্য্যন্ত আলমারির গায়েই ঝুলচে।

—ওটা আমার স্বকৃত অপরাধ। আলমারিব গা থেকে চাবিটা অবশ্য খুলে রাখাই উচিত, কিন্তু তাতেও বড় কম বিপদে পড়তে হয না।

—কি বলুন তো ?

—কোথায় ওটাকে রাখি, খোলবার সময কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

লীলা কোন কথা বললে না ; কিন্তু তার আর্দ্র দৃষ্টির দিকে চেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুধাংশুর এই বে-হিসেবী জীবন যাত্রার ছবিটা তার মনকে হঠাৎ স্পর্শ করেচে। বাইরে যে মানুষ সামাজিক শিষ্টতা এবং নিখুঁত ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ, তার ব্যক্তিগত জীবনে হঠাৎ এই ধরণের বিশৃঙ্খলার পরিচয় পেলে, সত্যই একটু বিস্মিত হতে হয়।

ভাল লাগে আপনার এমনি করে দিন কাটাতে ?

উপায় কি বলুন! আমার করকোষ্ঠী বিচার করে গণক ঠাকুররা যে রায় দিয়েছেন তা শুনলে আপনি বোধ হয় আরও আশ্চর্য্য হবেন।

বলুন না শুনি।

সুধাংশু একটু হেসে বললে, পয়লা নম্বর, সেকালের ভীষ্মদেবের মত unmarried life, দ্বিতীয়তঃ উচ্চাকাঙ্খার মাত্রাটা একটু বেশী এবং যাকে আপনারা হৃদয় সংক্রান্ত ব্যাপার বলেন, সে সম্বন্ধে একেবারে আদর্শবাদী। আকাঙ্খা অনেক, সেগুলো চরিতার্থ করবার পথও রয়েচে অজস্র, কিন্তু কোথায় যেন বেহিসেবী এক দেবতা বসে বসে আমার জীবনের গ্রন্থিগুলোকে এলোমেলো করে রাখচেন।

—আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

—হয়তো করি না। জীবনের ঘটনার স্রোতকে কিন্তু এড়িয়ে যাই কেমন করে? কোষ্ঠীর ফল জানবার পর, ভয়ে ভয়ে একদিন চেরোর সমস্ত সেট্‌টাই কিনে এনেছিলাম। সেগুলো আমার বিছানার উপরেই খুঁজে পাবেন। সময় পেলেই পড়ে দেখি।

—এ সমস্ত কুসংস্কারকে কিন্তু এড়িয়ে চলা চাই সুধাংশুবাবু।

—নিশ্চয়ই এবং সেই চেষ্টাই আমি করি। কিন্তু হাতের রেখাগুলো আমার সত্যিই জটীল আর ভয়ঙ্কর। চেরো পড়ে এ বিশ্বাস আমার বেড়েচে বই কমেনি।

—তাদের গবেষণার মধ্যে সত্য হয়তো কিছু আছে, কিন্তু নির্ভুল বলে নাই মেনে নিলেন সেগুলোকে!

—আমি তার জন্যে মোটেই ব্যাকুল নই লীলা দেবী। কিন্তু আমার সমস্ত যুক্তি দিয়েও কিছুতে সেগুলো হঠাতে পারিনে। একটা কথা আজ আপনাকে ইচ্ছে করেই বললাম না, তাতে আপনি হয়তো ভয় পাবেন।

কিন্তু যদি সময় এবং সুযোগ ঘটে, তখন তার জবাব আপনাকেই দিতে বলবো।

লীলা কোন উত্তর দিলে না, একটু অস্বাভাবিক ভাবে মৌন হয়ে রইলো।

সুধাংশু বললে, অনেক বাজে কথা বলা হোলো সেই বিকেল থেকে, আপনাকে প্রায় বিরক্ত করে তুলেচি, বেশ বোঝা গেল। চলুন, চলুন, বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিচ্চি।

লীলা বললে, আমার কিন্তু বাইরে যেতে ভাল লাগচে না।

তবে কি এইখানে বসেই আমার বক্তৃতা শুনবেন?

আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

নিশ্চয়ই নেই।—তা হলে খাবার কিছু আয়োজন করি? দু কাপ কোকো আর খান কয়েক নিরামিষ স্যাণ্ডউইচ?

নিরামিষ কি রকম?

সত্যিই তাই। আমি মাংসের বদলে স্যাণ্ডউইচে শুধু স্যালাড্ ব্যবহার করি। আমিষ খাবারগুলো আমার সহ্য হয় না। আপনার নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি নেই?

না থাকাই তো উচিত। কিন্তু আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, শুধু কোকোই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটটিতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, দুজনে বসলো এসে শোবার ঘরের খাটটা দখল করে। ভূটানী চাকরটা এসে আলো জাললে। হুকুম হোলো দু'কাপ কোকোর।

তার পর সুধাংশু বললে, আমার অনেক কথাইতো আপনি এসে পর্য্যন্ত জেরা করে জেনে নিলেন। কিন্তু আপনার কথা কিছুই শোনা হোলো না।

'কি বলবো বলুন।'—লীলা হাসতে হাসতে বললে।

সুধাংশু বললে, আপনার মতো জেরা করি, এমন ক্ষমতা আমার নেই।

তা হলে একা আমিই বলবো, আর আপনি বসে বসে শুনবেন?

সেও কি কম সৌভাগ্য বলতে চান?

নিশ্চয়ই খুব বড় সৌভাগ্য, কিন্তু কি যে বলবো সেইটেই ভেবে ঠিক করতে পারিনে।

—একটা কথা বলবো, যদি কিছু মনে না করেন।

—জেরা নয়তো?

—নিশ্চয়ই না।···তবু ভয় আছে, আপনি শুনলে হয়তো খুসী হবেন না।

—নাইবা খুসী হলাম, কিন্তু আপনার কথাতো শোনা হবে।

সুধাংশু হঠাৎ যেন উদ্দীপিত হয়ে উঠলো; ওর চোখেমুখে যেন খানিকটা রঙ লেগেচে! একটু চুপ করে থেকে বললে: আপনার সম্বন্ধে এই কদিন কত কথাই যে ভেবেচি, শুনলে আপনি হয়তো রাগ করবেন। সত্যি, সে দিন সিনেমায় আপনাকে যেন আশ্চর্য্য ভাল লেগেছিল···

লীলা একটু কুণ্ঠিত হোলো না; বললে: এমন কথা শুনলে মেয়েরা সচরাচর রাগ করে না সুধাংশুবাবু। আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

—না, না, আপনি আমায় ঠাট্টা করচেন, বুঝতে পারচি। কিন্তু আমি মনে যেটা ভাবি সেটা না বলে পারিনে। সত্যি, আজ যখন আপনি এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, তখন সূর্য্যের আলো এসে পড়েছিল আপনার মুখে। সে আলোয় আপনাকে দেখে মনে হোলো, Cynaraর উপমা বোধহয় একমাত্র আপনার সম্বন্ধেই খাটে—

—সিণ্ডেরিলা নয় ?

—আপনি আবার তামাসা করচেন। উপমার মধ্যে হয়তো বা কিছু ভুল আছে, কিন্তু সেইটেই তো দেখবার নয়, ভাল লাগাটাই সত্যি। আপনি অযাচিত ভাবে আমার এখানে আসবেন, কয়েকঘণ্টা আগে আমার পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যখন এলেন, তখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। মনে হয়েছিল, এটা হয়তো কলকাতার সভ্যসমাজের হৃৎপিণ্ড—হ্যারিংটন স্ট্রীটের ফ্ল্যাট নয়, কোন দূর দেশেব বন্দরে অপরিচিত একটি মেয়ে যেন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে রুমাল নাড়চে। আমার জাহাজ তখুনি ছাড়বে—কিছুতেই নেমে তার কাছে যেতে পারচি নে···

লীলা কোন কথা বললো না ; নিঃশব্দে সুধাংশুর হাতের আঙুলগুলি নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিল। তারপর সুধাংশুর মুখের উপর সকৌতুক চোখে চেয়ে বললে : কিন্তু এখন তো আপনার জাহাজ ছাড়বার কোন ভয় নেই···

আনন্দ এবং উত্তেজনায় সুধাংশু যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। লীলাব আর একটি উষ্ণ হাত ও টেনে নিলো নিজের মুঠির মধ্যে। কিউটেক্সের ভায়োলেট রঙে লীলার আঙুলের নখগুলি পর্য্যন্ত ওর চোখের তারার মতো ঝলমল করচে ! সুধাংশু ওর নখাগ্রগুলির উপর ভীরু স্পর্শ দিল তা'র ঠোঁটের।

রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়িকা মরে প্রমাণ করেছিল সে বেঁচে আছে ; আমাদের এই গল্পের অন্যতমা নায়িকা ললিতার যদিও মৃত্যু

ঘটেনি, তবু অসুস্থ থেকেই ও তার অস্তিত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সুকুমার এবং অনুপমকে প্রায় প্রতিদিন এসে তার হাতটা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হয়—অনুপম তো দেখা করতে এসে সহজে যাবার কথা ভাবতেই পারে না। তবু, অনুপম ছিল বলেই তো বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ দিনমানের পর সন্ধ্যাবেলাগুলি ললিতার কাছে একটু উপভোগ্য হয়ে ওঠে! সুকুমারও প্রায় প্রতিদিন আসে তার খোঁজ নিতে, কিন্তু কি অদ্ভুত লোক সুকুমার, দু একটা প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন আর কিছুই তার মুখে শোনা যায় না। ললিতার হাত আর দু' একদিনের মধ্যেই ভাল হবে এইটুকু জানিয়ে সান্ত্বনা দেওয়াই যেন ওর কাজ!

একদিন ললিতা তো রাগত কণ্ঠে বলেই ফেললে, সামান্য একটু হাতের ব্যথা, ওতো সারবেই, তার জন্যে আপনাদের এতখানি উৎকণ্ঠা দেখে আমারই লজ্জা করে সুকুমারবাবু! আমি বেশ আছি, ভাল আছি—দয়া করে ও সম্বন্ধে কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না। অন্য কথা কি নেই আপনাদের?

সুকুমার সাদাসিধে লোক—মানুষের মুখের কথার গভীরতর অর্থভেদ করা ওর অভ্যাসের বাইরে; একটুও বিব্রত না হয়ে বললে, এর মধ্যে উৎকণ্ঠার কোন কথা নেই ললিতা, তুমি এই বাড়ীতেই আছো এবং প্রায়ই যখন এদিকে আমায় আসতে হয়, তখন কর্ত্তব্যের খাতিরেও দু'একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা দরকার।

বলা বাহুল্য সুকুমারের কথায় ললিতা খুসী হয় নি। হঠাৎ তার মুখ যেন অন্ধকার হয়ে এসেছিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ললিতা বলেছিল: এদিকে না এলে আপনি যে আমার খোঁজ নেবার

জন্য এতদূর আসতেন না, তাও জানি সুকুমারবাবু। সে কথা নাই বা মনে করিয়ে দিলেন।

সুকুমার বললে, না, না, স্মরণ করাবার জন্য আপনাকে এ কথা বলিনি, এ জন্য আপনি যদি ক্ষুণ্ণ হ'ন তা হলে আমি ভারি দুঃখিত হব।

'—আমি ক্ষুণ্ণ হয়েচি কে বললে আপনাকে ?'—হঠাৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ললিতা বলেছিল।

সুকুমার কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে ললিতার মুখের দিকে চেয়েছিল, কোন কথাই সে বলতে পারে নি, ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে ললিতার ঘরে সুকুমারের যাতায়াতটা গেছে কমে। কেবল অনুপমের উৎসাহ এখনও ক্লান্ত হয় নি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অনুপম এসে হাজির হয় এই বাড়ীতে। নিচে বসে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে, তারপর উঠে আসে উপরে। কেতকীর সন্ধান মেলে কম—তার নাকি পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী ; নিজের পড়ার ঘরের গণ্ডীর মধ্যেই তার অধিকাংশ সময় কাটে। কোন কোন দিন হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে, অনুপমকে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যায়। লীলার কথা ছেড়েই দিয়েচে ললিতা! কি অদ্ভুত মেয়ে—কখন আসে, কোথায় যায় তার কোন ঠিক-ঠিকানা মেলা ভার! দুচার দিন পরেই তাদের কলেজ খুলবে, কিন্তু সে বিষয় তার কোন দুশ্চিন্তাই নেই। মাঝে মাঝে এসে হয়তো ললিতার কাছে বসলো। কিন্তু দু পাঁচ মিনিটের বেশী এক জায়গায় তাকে ধরে রাখবে কে? আলাপের মধ্যে হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে করে ঘর থেকে উঠে যায়, তারপর সমস্ত দিনের মধ্যে তার দেখা পাওয়াই ভার। চারিদিকের এই নির্লিপ্ততার মাঝখানে একা অনুপমই আসে মধুর একটি

অন্তরঙ্গতা নিয়ে। দেশবিদেশের ছন্নছাড়াদের বিচিত্র জীবন-যাত্রার কথা ওর মুখে মুখে। প্যারীর ল্যাটিন কোয়ার্টার, লণ্ডনের আধশিলিং কাফে, আমেরিকার নাইট-ক্লাব···সব কিছুর কথাই ও বসে বসে ললিতাকে শুনাবে।

ললিতা মধ্যে মধ্যে বিব্রত হয়ে বলে : আমাকে এসব গল্প শোনান্ কেন বলুনতো ? আমি যে মাথামুণ্ডু কিছুই ভাল করে বুঝতে পারি নে।

অনুপম কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হবার পাত্র নয়। ও বলে : নাই বা বুঝলেন, যাদের বিদ্যে এবং বুদ্ধি অনেক, ভাল করে বোঝবার জন্যে তাঁরা তো আছেনই—কিন্তু ভাল করে উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সমস্ত রহস্যই মাটী! কতকটা কল্পনা এবং কতকটা উপলব্ধির মধ্যেই ঘর-ছাড়াদের জীবনের সার্থকতা!

—এত ভাল লাগে আপনার ওদের জীবন ?

—কত ভাল লাগে, শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি এদেশেব কেউ নই, দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেচি—মান্ধাতার শেষ stronghold এই দেশটীতে! আমার নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, মিল নেই। কলকাতার পথগুলো কখনও প্যারীর বুলেভার্দ বলে মনে হয়, মনে হয়, শীতের কুয়াসায় একদিন বাড়ী ফেরার পথে হঠাৎ দেখা হবে বনকালো সাটিনের পোষাক-পরা পরিণতযৌবনা একটি মেয়ের সঙ্গে ; ধরে নিন, দেখা হবে একটা গ্যাস-পোষ্টের তলায়, গাঢ় কুয়াসার মধ্যে তার মুখের উপর হলদে খানিকটা আলো এসে পড়েচে আর বাঁ হাতের দুটি আঙুল দিয়ে ও চেপে ধরে আছে একটা সিগারেট্··· সিগারেট্ থেকে উঠচে সাপের মত আঁকা বাঁকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী···

—এমন করে ভাবতে না পারলে, কবিতা লেখা যায় না, নয় অনুপমবাবু ?

—ঠিক এই নিয়েই কবিতা একটা লিখেও ছিলাম। কিন্তু প্রশংসার চেয়ে পরিহাসই মিলেছিল একটু বেশী মাত্রায়। একজন বিখ্যাত কাব্য সমালোচক লিখেছিলেন—'যাক্ আর ভাবনা রহিল না। অনুপমবাবুর মত আর দুই একজন কবির সাক্ষাৎ মিলিলেই কলিকাতা প্যারিস হইয়া যাইবে এবং আমরাও তখন পথে ঘাটে বিদেশিনী নায়িকা খুঁজিয়া পাইব। ফিটনওয়ালাকে অনর্থক ঘুষ দিতে হইবে না।' এতে কবিতা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি, কিন্তু কৌশলে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন ! এক জায়গায় লিখেছিলাম :

তোমার মুখেতে চেয়ে দেখচি কি জানো মেয়ে ?
প্যারিসের আধো-আলো পথ ;—
কুয়াসায় ঢাকা পথ, তুষার-বিছান পথ
—উধাও ছুটেচে মনোরথ !
জনহীন ফুটপাথ, প্যারিসের বুলেভার্দ,
ল্যাম্পের পাশে তুমি একা,
জ্যান্ত ষ্ট্যাচুর মত— করুণ ষ্ট্যাচুর মত ;
হঠাৎ দুজনে হলো দেখা !
এক হাতে ভায়োলেট ; আধ-পোড়া সিগারেট
ছিল বুঝি আর এক হাতে,
আমার চোখেতে চেয়ে ছুটে এলে প্রাণ পেয়ে,
...ঘরেতে এলাম সাথে সাথে !

এই লাইনগুলি পড়ে সমালোচক লিখলেন—'কাহারও মুখের দিকে চাহিয়াই যদি প্যারিস দেখা যায়,...তাহা হইলে খরচা অবশ্য খুব অল্পই

পড়িবে।' বলুনতো, এই কি কাব্য-সমালোচনা?

ললিতা বললে, কাব্য-সমালোচনা করি এমন ক্ষমতা নেই, কিন্তু আপনার কথা শুনে ভারি আশ্চর্য্য লাগে···মনে হয় সব কথা যদি বুঝতে পারতাম!

অনুপম বললে, আপনার মনে আছে যথার্থ কাব্য-প্রীতি, তাকে আপনি চাপা দেবেন কি করে! আমার সময় নেই ললিতা দেবী, নইলে পৃথিবীর সমস্ত কাব্যের সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম।

—সময় নেই একথা তো আপনার মুখে প্রায়ই শুনি। কিন্তু কেন আপনার অভাব এত সময়ের?

—সংসারে বুদ্ধিমানরা যাকে কাজ বলেন সে রকম কিছুই আমার করবার নেই বলে। এই দেখুন না, দিল্লীর একটা সাহিত্য-সম্মিলন থেকে কড়া তাগাদা এসেছিল হাজির হবার জন্য, এমন কি যাতায়াতের খরচাটা পর্য্যন্ত তারা পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু যেতে পারলাম না। মাঝখান থেকে টাকাগুলো খরচ হয়ে গেল। জীবনের কোথায় যেন রয়েচেন এক দুষ্টবুদ্ধি দেবতা, যিনি কেবল অকাজের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত সময় কেড়ে নিলেন। সত্যিই যদি একটা কাজ করবার সঙ্কল্প করি সেটা কিছুতেই শেষ করতে পারিনে। দুলাইন কবিতা লেখবার পর মনে হয়, ট্রামে চড়ে একবার কালিঘাট পর্য্যন্ত ঘুরে আসি কিম্বা ঘুমিয়ে পড়ি। লোকের যখন ঘুমুবার সময়, হঠাৎ তখন মনে হয়, কবিতা লিখলে মন্দ হোত না। চিন্তায় এবং কাজে এমনি গরমিল দেখে আসচি চিরকাল।

ললিতা স্নিগ্ধ একটু হেসে বললে: বিয়ে করে ছোট্ট একটু সংসার পাতুন না অনুপমবাবু, তাতে হয়তো মিল খুঁজে পাবেন।

—হয়তো পাবো। কিন্তু নিশ্চয় পাব, এমন কথা বলা চলে না আর

ভয় আমার সেইখানে। খাওয়া দাওয়ার ঠিক থাকে না, কোনদিন স্নান হয়, কোন দিন হয় না—সমস্ত দিন হয়তো কোন বন্ধুর বৈঠকখানাতেই কাটিয়ে দিই···হঠাৎ হাতে কিছু পয়সা পেলে হোটেলে গিয়ে ঘণ্টা তিনচার কাটিয়ে আসি ··তবু তার মধ্যেই যেন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য, অনেক স্বাধীনতা। জীবনে ভরে খুঁজেচি বন্ধুত্ব, পেয়েচিও ঢের ; সংসার বাঁধি, প্রেম করি··· এমন ধৈর্য্য আমায় বিধাতা দিলেন না। আমার কাছে প্রেম মানে অধ্যবসায়—Perseverence.—সে আমি পাব কোথায় ?

—আপনি দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চান অনুপমবাবু।

—সে কথা অস্বীকার করিনে শ্রীমতী ললিতা। আর আজকের দিনে আমি হয়তো একা নই। দলে আছেন অনেকে। কিন্তু তারা সাহস পায় না নিজেকে বিচার করে দেখতে। হঠাৎ নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা কাজ করে ফেলে। তারপর যে দুঃখ তারা ভোগ করে তার কোন হিসেব নেই। আমি পৃথিবীতে দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই নে। পারি যদি চিরকাল এমনি হৈ চৈ করে কাটিয়ে যাব।

—কিন্তু চিরকাল কি তা যায় অনুপমবাবু ?

—হয়তো যায়, কিম্বা যায় না। যদি নাও যায় তার জন্যে অভিযোগ করবো না। সংস্কৃতে একটা শ্লোক পড়েছিলাম—'ক্ষণং প্রজ্জ্বলিতং শ্রেয়ঃ নচ চিরং ধূমায়তে !' আমি সেই মুহূর্ত্তের উপাসনা করি ·····

এমনি করে কাটলো দিন কয়েক। লীলাদের কলেজ খোলবার সময় এল। জিনিষপত্রের গোছগাছ চলতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একদিন লীলার ডাক পড়লো দক্ষিণাবাবুর ঘরে।

দক্ষিণাবাবু আরাম কেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লীলা ঘরে ঢুকতেই পাশের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে দক্ষিণাবাবু বললেন, বসো।

লীলা দীর্ঘকাল এ-বাড়ীতে যাতায়াত করচে, কিন্তু পারতপক্ষে দক্ষিণাবাবুকে ও এড়িয়ে চলে। আজ এমনি ভাবে তাঁর সামনে এসে বসতে লীলা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। প্রথমে ভেবেছিল, কেতকীকে দেখতে পাওয়া যাবে ঘরের মধ্যে, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া গেল না। লীলার অস্বস্তির মাত্রা গেল বেড়ে। মিনিট পাঁচেক কেটে গেলো, দক্ষিণাবাবু কাগজের পাতা থেকে মুখ তুললেন না। শেষ পর্য্যন্ত লীলাই মৌন ভঙ্গ করলে।

—কিছু বলছিলেন আমাকে ?

দক্ষিণাবাবু এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন, বললেন, হ্যাঁ, একটু বিশেষ কথাই ছিল তোমার সঙ্গে। হয়তো সেগুলো ভাল শোনাবে না, কিন্তু না বলেও কোন উপায় দেখচি না।

লীলা উদ্বিগ্ন চোখে দক্ষিণাবাবুর দিকে চাইলো। দক্ষিণাবাবু বলতে লাগলেন, শেষ বয়সে ছেলেটা আর মেয়েটাকে নিয়ে নিরিবিলিতে দিনগুলো কাটাবো মনে করে সহরের এই একপাশে আস্তানা বেঁধেছিলাম। কিন্তু আজ এই বাড়ীতে অশান্তির ঝড় উঠেছে,—বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু তাকে আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। ছেলেটা মেতেচে থিয়েটার-বায়স্কোপ নিয়ে, কখন আসে, কখন যায়, কোথায় থাকে, কি করে—কিছুই বুঝতে পারিনে। তবু তার জন্যে কখনও ভাবি না। পুরুষ-মানুষ—নিজের পথ যদি নিজেই বেছে নিয়ে থাকে, আমি তাতে বাধা দেব কেন ?

দক্ষিণাবাবু একটু থামলেন। কিন্তু তাঁর কথাগুলি যে কিসের ভূমিকা তা কল্পনা করতে না পেরে লীলা রীতিমত বিপন্ন বোধ করতে লাগলো…

দক্ষিণাবাবু নিভন্ত বর্ম্মা চুরুটটায় টান দিয়ে বলতে লাগলেন, কিন্তু কদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, কেতকীর মনেও কোথায় যেন অশান্তির কাঁটা বিঁধচে। যে জিনিসটা আমার চোখে একেবারে পড়েনি, তা ও কি করে যেন লক্ষ্য করেচে।

—কি বলুনতো ?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, তা হলেও আমাদেব সাবধান হওয়ার সময় এসেচে। তুমি ললিতাকে একটু সতর্ক হতে বলো।

—কিন্তু আমি যে এর কিছুই বুঝতে পাবলাম না কাকাবাবু।

—তুমি লক্ষ্য করো নি, কিন্তু বাড়ীতে আরও দু চারজন রয়েচে। মনে তাদের সন্দেহ জেগেচে।

—ললিতার সম্বন্ধে ?

—ঠিক সে কথা বলা হয়তো উচিত হবে না, অন্ততঃ আমি তা ভাবতে পারি না। কিন্তু তোমাদের ওই অনুপম ছেলেটা ইদানিং যে ভাবে ললিতার সঙ্গে মেলামেশা করচে, তাতে কি তুমি সাবধান হওয়া দরকার মনে করো না ?

—অনুপমবাবু আর ললিতা !… কিন্তু কেতকী-দিই তো অনুপমবাবুকে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে কাকাবাবু!

—হয়তো লেখক হিসেবে উনি শ্রদ্ধাব পাত্র, কিন্তু তা বলে একটি অনভিজ্ঞ মেয়ের অসুস্থতার সুযোগ এ ভাবে গ্রহণ করা তাঁর উচিত হয় নি। তিনি যদি তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন ধরে কাব্য-আলোচনা

করতেন, তাতে আমাদের আপত্তি করবার কারণ ঘটতো না মা, কারণ, তোমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারো, বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বিচার করতে শিখেচো, কিন্তু ললিতার উপর আমরা অতখানি নির্ভর করতে ভয় পাই। তা ছাড়া আরও একটা কথা এই যে, আজকালকার এই লেখক জাতটার ওপর আমার কোন আস্থা নেই। ওদের গল্প-কবিতা পড়ে তোমার কি এই কথাই মনে হয় না যে ওরা সমাজ মানে না, শৃঙ্খলা মানে না, পাপ মানে না, পুণ্য মানে না, ভাল-মন্দর তফাৎ নেই ওদের কাছে—বোধ হয় ঈশ্বরকেই ওরা স্বীকার করে না?

মানুষ সম্বন্ধে লীলা এতদিনে অন্ততঃ সাবধান হয়ে চলতে শিখেচে। তবু দক্ষিণাবাবুর কথাগুলি লীলা যেন নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিতে পারলো না। তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো: মীরাট মামলায় সরকারী উকীল একদল লোক সম্বন্ধে এই ধরণের কতকগুলো কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারা লেখক নয়, কম্যুনিষ্ট। তাদের সম্বন্ধেও বোধহয় এ কথা খাটে না কাকাবাবু।

দক্ষিণাবাবু সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতির লোক, কিন্তু মেয়েদের মুখে কথার জবাব তিনি পছন্দ করেন না। এ বিষয়ে তিনি শতকরা নিরানব্বই জন বাড়ীর কর্ত্তাদের দলে। লীলার প্রতিবাদ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারলে না, মুখ তার কঠিন হয়ে এলো। খবরের কাগজখানা বন্ধ করে রাখতে রাখতে বললেন, এ ব্যাপারটা তোমাকে নিয়ে ঘটলে আমার কিছুই বলবার থাকতো না, কিন্তু ললিতাকে জয়ন্ত আমার কাছেই রেখে গেছে। যতক্ষণ আছি, তার ভালমন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্ত্তব্য। তুমি অনুপমকে এখানে আসতে মানা করো।

লীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এ বাড়ী আপনার,

মানা যদি করতেই হয়, সে কথা আপনি ওঁকে জানিয়ে দিলেই ভাল হবে কাকাবাবু···আমার কথা তিনি গ্রাহ্য করবেন কেন!

দক্ষিণাবাবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন; তারপর বললেন, বেশ, আমি নিজেই তাঁকে জানিয়ে দেব। কিন্তু এ সম্বন্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ যেন শুনতে না হয়।

—'অন্ততঃ আমার তরফ থেকে নয়, এটুকু জেনে রাখুন।'—বলে লীলা ঘর ছেড়ে চলে এল।

সত্যিই এ বাড়ীতে ঝড় ঘনিয়ে এসেচে, লীলা তার স্যুটকেশ গুছোতে গুছোতে ভাবতে লাগলো। আর এই ঝড় তুলেচে কি কেতকী? ওকেই লীলার সন্দেহ হয় বেশী। কেতকীর মধ্যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন লীলা কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করেচে। ললিতাকে কেতকী বিশ্বাস করতে পারে নি, অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়। এ অবিশ্বাসের জন্ম কোথায়, লীলা বসে বসে ভাবতে লাগলো। অপ্রীতিকর এই ব্যাপারটার আড়ালে সুকুমার নেই তো কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে? তাই যদি হবে, অনুপমের সম্বন্ধে এতখানি সাবধানতা কেন, কেন সেই খেয়ালী মানুষটির এই অকারণ লাঞ্ছনা? কেতকীর দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ, কোন কিছুই সে লক্ষ্য করতে ভোলে না, এই কথাই প্রমাণ করবার জন্য নয়তো?

লীলা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না। হোষ্টেলে তাকে আজই ফিরে যেতে হবে—আজকের এই ঘটনার পর এখানে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এতখানি ধৈর্য্য নিয়ে সংসারে সে আসে নি। কিন্তু ললিতা? তাকে এ কথা ও কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না। আজই বিকালে ও নিঃশব্দে এখান থেকে বিদায় নেবে। ললিতা যদি আভাসেও

এ কথা জানতে পারে তারপর তাকে এখানে ধবে রাখা হবে কঠিন। দাদাকে এই বিষয়ে একটা চিঠি লিখলেও হয়। কিন্তু লিখেই বা কি হবে? তিনি এখুনি কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটে আসবেন, অথচ ললিতার কোন ব্যবস্থাই করতে পাববেন না। উপস্থিত চিঠি লেখা স্থগিত থাক। অবস্থা যদি আবও জটিল হয়ে ওঠে তখন দাদাকে ও চিঠি লিখবে। তা ছাড়া, ললিতা সম্বন্ধে দক্ষিণাবাবুর মনে সত্যি কোন মন্দ ধারণা নেই। এখনও তিনি ললিতাকে যথেষ্ট স্নেহ কবেন। তাঁব সম্বন্ধে অবিচাব করবে না লীলা। আজকেব ব্যাপাবে ললিতাব চেয়ে তিনি লীলাব অপমানই করচেন বেশী। সুতবাং তাবই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সবে যাওযা প্রয়োজন; তা ছাড়া, সে তো যেতোই—কাল না হয আজ!

বিকাল বেলা লীলা চলে গেল হোষ্টেলে।

যাবাব সময ললিতাকে শুধু বললে, দবকাব হলে হোষ্টেলে খবর দিস। এখানে আর ভাল লাগচে না—সেখানে তবু দুচাব জন বন্ধুব সঙ্গে দেখা হবে।

দক্ষিণাবাবু আব কেতকীকে নমস্কার জানিযে লীলা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো; তাঁবা কোন কথাই বললেন না। লীলার এই চলে যাওয়ার মুহূর্ত্তটিতে ললিতা আজ যেন সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করলো তাব একাকিত্ব। দুই চোখে তার জল ভরে এলো। চাকবগুলো স্যুটকেশ, বিছানা, বইয়ের বাক্সগুলো গাড়ীতে তুলচে, শ্রাবণমাসেব ঘোলাটে আকাশের মতো গম্ভীর মুখ নিযে লীলা বসে আছে ট্যাক্সির এককোণে হেলান দিয়ে—গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেই হয়। গেটের কাছে সেই সময় দেখা গেল চেষ্টারফিল্ড-আবৃত অনুপমের মূর্ত্তি!

সেইখান থেকেই লীলার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে অনুপম বললে : মিস রায় হঠাৎ কোথায় চললেন ?

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দৃশ্যটা যেন আরও বিশ্রী হয়ে উঠলো। কেতকীকে নিয়ে দক্ষিণাবাবু ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন, লীলা হঠাৎ কি জবাব দেবে ঠিক করতে পারলো না, আর হতবুদ্ধির মতো ললিতা দাঁড়িয়ে রইলো গাড়ীবারান্দার নিচে।

এমনিভাবে অনুপমের সঙ্গে দেখা হবে লীলা কল্পনা করে নি। অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে চোখের সামনে ঘটতে না দেওয়াই তার তাড়াতাড়ি হোষ্টেলে যাবার উদ্দেশ্য! কিন্তু অনুপমের আকস্মিক আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

অনুপম বললে, মোটবাট সব বাঁধা, হোষ্টেলে চললেন নাকি ?

লীলা বললে, হ্যাঁ, কলেজ খোলবার আর দেরী নেই।

—কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম, এখনও দিন দুই থাকবেন আপনি এখানে। হঠাৎ মত বদলালেন কেন ?

—হঠাৎ নয়, যেতে আমাকে হোতোই···

অনুপম এতক্ষণে গাড়ীবারান্দার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পেল। সে দিকে চেয়ে বললে : দক্ষিণাবাবু আর শ্রীমতী কেতকীকে দেখলাম দাঁড়িয়ে রয়েচেন—হঠাৎ কোথায় গেলেন তাঁরা ?

অনুপম উৎকণ্ঠিত হয়ে গাড়ীবারান্দার দিকে অগ্রসর হোলো আর ঠিক সেই সময় লীলা বললে, আসুন না অনুপমবাবু, কলকাতা পর্য্যন্ত আমায় পৌছে দেবেন।

—কিন্তু···এদের সঙ্গে দেখা হোলো না যে! দক্ষিণাবাবু কি ভাববেন···

—দেখা হলেই হয়তো তিনি বেশী ভাববেন। আসুন, আসুন, একা যেতে আমার ভাল লাগছিলো না—তবু এই পথটুকু গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

অনুপম একবার ললিতার দিকে, একবার লীলার দিকে এবং আর একবার গাড়ীবারান্দার নিচে, ভিতরে যাবার পথের দিকে চাইলো! কিন্তু হঠাৎ কিছুই বুঝতে পারলো না। নির্ব্বোধের মতো ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে: চলুন, নিখরচায় খানিকটা ট্যাক্সি চড়া হবে—

পর মুহূর্ত্তে ট্যাক্সিখানা গেট পাব হয়ে অদৃশ্য হোলো আর আজকের অপরাহ্নের সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ যেন রহস্যময় দুর্ভাবনার মতো, গাঢ় ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মতো ললিতার মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠলো। দ্রুত উপরে উঠে ললিতা তার ঘরে খিল দিলো। মনে মনে বললো, আমি একা, ভয়ানক একা!

ট্যাক্সি গেট থেকে বা'র হতেই অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বলুন তো, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারলাম না।

লীলা বললে, আপনাকে আসন্ন একটা বিপদ থেকে রক্ষা করলুম।

তা স্পষ্টই বুঝতে পারচি, কিন্তু সেটা এলো কোন্ দিক থেকে?

দক্ষিণাবাবুব দিক থেকে—শ্রীমতী কেতকীর ঘর বেয়ে।

হেতু?

আপনার কাব্য-চর্চ্চা।

শ্রীমতী ললিতার সম্পর্কে—?

ঠিক তাই।

অনুপম অল্পকাল মৌন হয়ে রইলো। তারপর বললে: সাধারণতঃ

মানুষ এমন ঘটনায় আশ্চর্য্য হয়। আমি কিন্তু এগুলোকে অত্যন্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করি। দক্ষিণাবাবুর সামনাসামনি কথাটা জানতে পারলে আরও ভালও হোতো লীলা দেবী। অন্ততঃ তাঁর মুখের সামনে বলে আসতে পারতাম—'বাড়ীটাই গেঁথেছেন কেবল বালিগঞ্জে, কিন্তু মন রয়ে গেছে সেই পল্লী গ্রামে—সেখানকার খানা ডোবাগুলোর মতো দুর্গন্ধ হয়ে।'

—কিন্তু এ ব্যাপারে দোষের মাত্রা বোধ হয় দক্ষিণাবাবুর চেয়ে কেতকীর বেশী, অনুপমবাবু। এতদিন তার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতাম, আজ সত্যি লজ্জা পেয়েচি তার ব্যবহারে। কি যে তার অদ্ভুত আচরণের হেতু তাও ঠিক বুঝতে পারলম না।

গাড়ীর চাকা গড়িয়ে যেতে লাগলো, অনুপম কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো ভাবলো। তারপর বলসে: আমি কতকটা অনুমান করতে পারি লীলা দেবী।

—কি বলুন তো?

—কেতকীর নিজের উপর বিশ্বাস নেই মোটে—ভারি দুর্ব্বলচিত্ত। ওর মনে জেগে রয়েচে ভয়—কে ওর প্রেমাস্পদকে তার আঁচলের আড়াল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! এ দিক থেকে ললিতাকে ওর ভয় সবচেয়ে বেশী। মনে মনে ও ভালই জানে যে বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে ললিতা যত ছেলেমানুষই হোক, রূপের দিক দিয়ে ওর তুলনা অন্ততঃ দক্ষিণা-নিবাসে নেই। সুকুমার যেদিন ট্যাক্সিতে করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল সেদিন কেতকীর মুখের ভাব আপনি দেখেন নি, আমি দেখেছিলাম—নইলে সেদিনই তার সমস্ত আচরণের অর্থ আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। সেই ঘটনার পর কেতকীর আচরণে আপনি কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নি?

—করেছিলাম—কিন্তু তার অর্থভেদ করি এমন সাহস ছিল না। আজ অনেক কথাই বুঝতে পারছি। তবু এ প্রশ্নটা থেকেই গেল—আপনার সম্বন্ধে তার এই অবিচার কেন ?

—অবিচার না হতেও পারে। ললিতাকে আমার ভাল লেগেছিল, একথা আজ আপনার কাছে অস্বীকার করবো না। ভবিষ্যতে কোন দিন আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম কি না তাও আজ বলা শক্ত। সুতরাং সে দিক থেকে এ ভালোই হোল। কিন্তু আমার প্রতি কেতকীর এই ব্যবহারের আরও একটী কারণ বোধ করি নির্দ্দেশ করা যায়—

লীলা কৌতূহলী হয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকালো।

অনুপম বললে, ললিতা সম্বন্ধে সুকুমারকে সাবধান করে দেওয়া ; একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে প্রমাণ করা যে ললিতা অতি লঘু চরিত্রের মেয়ে, তার প্রতি কারও মনোযোগ দেওয়াটা কেবল অন্যায় নয়, অভদ্রতা !

লীলা ভাবতে ভাবতে বললে, আশ্চর্য্য কি !

অনুপম একটু হেসে বললে, মোটেই নয়। সভ্যতায় আমাদের বাইরের চেহারাটাই বদলেছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমরা আজও তেমনি 'প্রিমিটিভ' থেকে গেছি। কেতকী সম্বন্ধে শুধু একটী কথা বলা চলে—ah my modern girl !

কথাবার্ত্তার মধ্যেই গাড়ী এসে থামলো লীলাদের হোষ্টেলের দরজায়।

লীলা বললে, ভিতরে আসবেন না ?

অনুপম বললে, অন্ততঃ আজকের দিনটী আমায় আপনাদের নাগালের বাইরে থাকতে দিন।

—কোথায় যাবেন এখন ?

—ঠিকানা নির্দ্দিষ্ট নয়—সম্ভবতঃ কোন হোটেলে। বালিগঞ্জের আব-হাওয়াটা আমার পক্ষে ছিল একটু বৈদেশিক। ঠিক যে সহ্য করতে পারতাম তা নয়, তবু যেতাম—সমাজের একটী দিক যাতে অদেখা না থেকে যায়, সেই জন্যে। হঠাৎ একদিন রাসবিহারী পার্কে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, আর সেই সূত্র ধরেই গিয়ে পৌঁছেছিলাম একেবারে ওঁদেব অন্দব মহলে। তেমনি হঠাৎ আজ বেরিয়ে এলাম। এই দিনটিকে সেলিব্রেট করা প্রযোজন।

—বালিগঞ্জের মেযেদের সম্বন্ধে আপনি একদিন একটী কবিতা পড়েছিলেন, তা'তে আমাদের প্রতি আপনি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ কবেন নি। সেদিন আপনার প্রতি কেতকী ক্ষুণ্ণ হযেছিল এবং বোধ হয় আমিও। কিন্তু তার জন্য আপনার প্রতি রাগ করবার পথ আজ কেতকীই বন্ধ করে দিযেচে।

—আজকের ঘটনার জন্য আমি ওঁদের আক্রমণ করে নতুন কোন কবিতা লিখবো না, এটুকু বিশ্বাস করুন। আমি সেদিনও জানতাম যে বালিগঞ্জ সম্বন্ধে আমাব ধারণাই চবম নয এবং আজও তা বিশ্বাস করি। জীবনে আমার 'dogma'র বালাই নেই, এটুকু অন্ততঃ আপনি বিশ্বাস করবেন।

Our candle burns at both the ends
It will not last till the night.
But, oh my friends and ah my foes!
It casts a lovely light.

কিন্তু কবিত্ব থাক লীলা দেবী, আজকের দিনে এত বড় নেকামী আর নেই। এই ক'দিনের ছোটখাট ইতিহাসগুলি অনেকদিন আমার মনে

থাকবে, এই কি কম লাভ? ললিতা দেবীকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর মনে আমি কবিতার বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেচি; সে আলোয় পথ চিনে নিতে তাঁর যেন ভুল না হয়। বন্ধুর কামনা শুধু এইটুকু।

ট্যাক্সি থেকে বিছানাপত্র ততক্ষণ ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েচে। অনুপম সেই ট্যাক্সিখানাতেই উঠে বসলো এবং লীলাকে নমস্কার জানিয়ে বললে: আমার নতুন কবিতাটা ললিতা দেবীকে পড়িয়ে শোনান হলো না, সে কাজের ভার আপনার উপরেই দিয়ে গেলাম।

অনুপম পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বা'র করে লীলার হাতে দিল এবং ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বললো, 'মোলে রুজ', ড্রাইভার!

নিজের ঘরে এসে লীলা সর্ব্বাগ্রে অনুপমের কবিতা পাঠে মন দিল। কবি হিসেবে অনুপমকে সে শ্রদ্ধা করতো, কিন্তু আজকের কবিতার সরলতা ও দুঃসাহস লীলাকে মুগ্ধ করলো। সে এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে ফেললে। কবিতাটির নাম 'গোধূলি-লগ্ন'—অসমছন্দে লেখা দীর্ঘ কবিতা।—

পথিক-জীবনে পাথেয় হয়েচে বহুজন পরিচয়,
কেউ বা ললিত লবঙ্গলতা, বনহরিণী বা কেউ,
ঢেউয়ের মতন হৃদয়-বেলায় ভেঙে চুরমার কেহ,
কেহ বা ক্ষণিক আশ্রয়শাখা, অবসর-বিনোদিনী।
কারেও ভাবিয়া ঘুম আসে নাক দুই চোখে সারারাত,
আকাশের তারা চোখের তারায় এক হয়ে যায় কারও দুই আঁখি স্মরি,
'প্যাসটেলে' আঁকা ছবি হবে কেউ, কেউ বা 'কিউবিজ্‌ম'!

দিনের আলোয় আমার কামনা প্যাঁচার মতন চোখ বুঁজে পড়ে থাকে,
নানা সামাজিক পোষাক আঁটিয়া ফিরি' জনতার মাঝে,
সিনেমায় যাই, পুনার রেসেতে বাজী ধরি' কষে' মেজে,
আগা খাঁর ঘোড়া ইব্রাহিমের চৌদ্দ পুরুষ মুখস্ত করে রাখি,
রেঞ্জার্স' আর ডার্ব্বির জুয়া—কিছুই দিইনে বাদ,
বন্ধুর সাথে হাসাহাসি করি পচা স্ক্যাণ্ডাল নিয়ে,
কবে কা'র বউ লজ্জার মাথা মুড়িয়ে খেয়েচে, সে সব আমার জানা,
বিকেলবেলায় কোন্ ছায়ানটী কি ভাবে কাটায় জানি,
ওরিয়েণ্টাল কানবালা কার কোথায় হয়েচে গড়া,
'ফ্রিল্'-তোলা তার নূতন জামার 'ডিজাইন' দিল কা'রা,
আমার গোপন নোটবুকে তার সঠিক খবর পাবে।

* * *

নিশীথে আমার শিকারী কামনা পথে পথে অভিসারী,
চোখের সামনে ভেসে যায় দূর অতীতের 'প্যানারোমা',
হৃদয়-দেবতা করে নিক কেউ, দেহের মিতালী পাতাইল কেহ বুঝি,
কেউ বা ঢেলেচে হৃদয়-পাত্রে মধুর প্রবঞ্চনা,
কেউ বা খুঁজেচে দু'হাত বাড়ায়ে, আমি চাহি নাই ফিরে,
দেবতার মত, মৃত্যুর মত আমি চির নিষ্ঠুর!
এমনি করিয়া নূতন যুগের সাজিয়াছি ঋত্বিক,
নীল হয়ে গেছে আমার চোখেতে নীলাকাশ আর সবুজ ঘাসের চারা,
'টাম্বলার'-ভরা ফেনায়িত মদ, সেও হয়ে গেছে নীল;
নূতন যুগের আমি নব মহাদেব!

* * *

এর মাঝে কেন তুমি এলে আজ, অকাল অরুণোদয়,
কোন্ গিরিচূড়ে তপস্যারতা ছিলে তুমি শৈলজা ?
শ্বেত করতলে বহিয়া আনিলে কি অসীম বরাভয়,
দুই কাণ আর সারা মন দিয়ে শুনিতেছি 'সোয়ান্ সং' !
চূর্ণিত তব কালো কেশরাশে জড়ায়ে এনেছো আদিঅরণ্যছায়া,
যুগল বক্ষ-কৈলাস পারে সুগভীর তব দূর-অবগাঢ় চোখ—মানসসরসী যেন,
ভুলাইতে চাহে আমারে আজিকে যন্ত্রযুগের কঠিন আর্ত্তনাদ,
'গ্র্যানিট'-সম নগর-পথের কুৎসিত ঊষরতা !
আমি চলে যাই আমারে ফেলিয়া দূরতর কোন দেশে—
শ্বেতবরাহেরা যেথানে চরিছে নিঃসীম নির্ভয়ে।
বিষুবরেখার অতি কাছ থেকে টেনে নিয়ে যাবে নাকি
যেখানে একাকী চাঁদ জাগিতেছে শ্বেততুষারের কোলে ?

*　　　*　　　*

ভিখারী শিবের ভিক্ষা ভুলাতে পরেছ এ কোন্ সাজ,
অপর্ণা, তুমি পণ করিয়াছ কাড়িতে শিবের ঝুলি ?
আমার শ্মশান-পৃথিবীতে বুঝি রাখিবে না আর স্মৃতির নর-কপাল,
চারু করতলে মুছাইবে এই পিঙ্গল জটারাশি ?
আমারে কাড়িবে আমার নিকট হতে, ভয় হয় তাই,
শঙ্কা জাগিছে নিঃশঙ্ক এ অন্তরে !
শিবের স্কন্ধচ্যুত সতী দেহ হবে যবে খান খান,
অপর্ণা তুমি প্রলয়-নৃত্য থামাবে কি ফিরে এসে ?

কবিতা পাঠ শেষ হবার পর লীলা অন্যমনস্কের মত দূর শূন্যে চেয়ে রইল। তার মনে হলো, এ শুধু অনুপমের কথা নয়, এ কথা আজকের বহু মানুষের। এ কথা তার যতখানি, সুধাংশুরও বোধ করি ঠিক ততখানি। মানুষ আর কিছুতে তার বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারচে না। ভাঙ্গন ধরেচে পৃথিবীর চারিদিকে আর তার ধাক্কা এসে লাগচে মানুষের মনে। কিন্তু ললিতা এর কিইবা বুঝবে!

রাত্রি তখনও গভীর হয়নি; সুকুমার দক্ষিণা-নিবাসে পৌঁছে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। চারিদিকে অপ্রীতিকর স্তব্ধতা, সবাই যেন এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েচে! এমন কি, অনুপমবাবুর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

সুকুমার বেয়ারাটাকে ডেকে কেতকীর খোঁজ নিল। তার কাছে এইটুকু খবর পাওয়া গেল যে শ্রীমতী কেতকী বাড়ীতেই আছেন—সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়েচেন। হঠাৎ কেতকীর অসুখ করলো না কি?

সুকুমার কেতকীর ঘরের সামনে এসে বার দুই নাম ধরে ডাকতে সাড়া পাওয়া গেল।

ভিতরে এসে সুকুমার বললে, আজ এরি মধ্যে সব চুপচাপ যে? তোমার শরীর খারাপ হয় নি তো কেতকী?

না।

কিন্তু সুকুমার কেতকীর কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না। কেতকীর মুখে ক্লান্তির সুস্পষ্ট আভাস, নিঃসঙ্গ সজ্জায় বহুক্ষণ ধরে সে যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিল।

সুকুমার বললে, কিন্তু এরই মধ্যে শুয়ে পড়েচ যে? অনুপমবাবুরও কোন সাড়াশব্দ পাচ্চি না···কি ব্যাপার বলতো?

অনুপমবাবু আর আসবেন না এ বাড়ীতে।

কেন, কেন ?

বাবা তাঁকে আসতে বারণ করেচেন।

দক্ষিণাবাবু!···কেন কেতকী ?

ললিতা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ক্রমে আপত্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

সুকুমার এতটা আশা করে নি। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারলে না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, তা' হ'লে এখন থেকে আমারও সাবধান হওয়া উচিত, কি বলো!

কেতকী হেসে বললে : বাঃ রে! তোমার সঙ্গে এবাড়ীর সম্বন্ধ অন্য লোকের মতো নয়, এ কথা কে না জানে!

—অর্থাৎ ? অনুপমবাবু আর আমার মধ্যে সামাজিক অবস্থার পার্থক্য অনেকখানি, এই তো ?

—আর জ্বালিয়ো না বাপু। তোমাকে সব কথা স্পষ্ট করে না বললে কিছুতেই চলবে না। একটু যদি বুদ্ধি থাকে তোমার!

—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। কিন্তু ললিতা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে মনে মনে মস্ত আঘাত পেয়েচেন ?

—ললিতা সম্বন্ধে তোমার যতখানি দুশ্চিন্তা, সেটুকু যদি আমাদের সম্বন্ধে হোতো!

—আমায় ভুল বুঝো না কেতকী—সত্যিই কি তাঁর দুঃখ পাবার কথা নয় ?

—না। ওদের দেশে ওকে নিয়ে কত কুৎসা রটেছিল, সে খবর তুমি রাখো ?

—জয়ন্তদার মুখে কিছু কিছু শুনেছিলাম—কিন্তু সেগুলো বিশ্বাস

করবার প্রবৃত্তি আমার হয় নি। সেগুলো সত্য হোক আর মিছে হোক, সে অন্য কথা। জীবনে যে অনেক দুঃখ পেয়েচে, তাকে নতুন করে দুঃখ দেওয়াটা কষ্টকর বৈকি।

কেতকী এবার রীতিমত ক্ষুণ্ণ হোলো। কে যেন তার মুখের উপর এক ঘা চড় বসিয়ে দিয়েচে। হঠাৎ তার সমস্ত চোখ-মুখ যেন রাঙা হয়ে উঠলো। ছেলেমানুষের মতো কেতকী বলে উঠলো: তুমি কি বলতে চাও যে ললিতাকে এ দুঃখ আমিই দিয়েচি?

সুকুমার হাসতে হাসতে বললে, তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করো না কেতকী। আমি সে কথা তোমায় বলি নি।

—তবে?

—আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম, যাকে আশ্রয় দিতে হয়, তাকে আঘাত দিতে নেই।

—অর্থাৎ বাবা খুব অন্যায় করেচেন?

—সব কথা আমি জানিনে এবং জানলেও এ সব বিষয়ে আমার মাথা খেলে না। তবু, দক্ষিণাবাবুর কাজের কোন সমালোচনা না করেই এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে অনুপমবাবু সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থা হয় তো ভালই হয়েচে; কিন্তু ললিতার প্রতি আমরা যেন অবিচার না করি।

ওর প্রতি তোমার এতখানি বিশ্বাস এলো কোথা থেকে?

বিশ্বাসটা আপনিই আসে কেতকী, তার জন্যে দিক্‌নির্ণয়ের দরকার হয় না। আমি সাধ্যমত কাউকে কঠিন কথা বলি নে, পাঁচ জনে যেখানে চীৎকার করে আসর জমায়, আমার সেখানে চুপ করে থাকা অভ্যাস; তবু আজ একথা বলতে তুমি আমায় বাধ্য করালে।

আহত অভিমান নিয়ে কেতকী যেন ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

সুকুমারের মনের আকাশে কেতকীই তো ধ্রুবতারা—এ কথা ওর চেয়ে বেশী করে জানে কে? তবু এ কথা কেতকী না বলে পারলো না—'তুমি ঠিক এই কথাই বলবে, আমি জানতাম।'

সুকুমার বললে, তোমার মনে এত জঘন্য চিন্তা ঠাঁই পায় এ কথা কিন্তু আমি জানতাম না।

—এখন সে কথা জেনে নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হও নি?

সুকুমার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের বাইরে যাবার উপক্রম করলো।

কেতকী একটু এগিয়ে এসে বললে: ললিতা উপরে একা রয়েচে—একবার দেখা করে যাবে না?

সুকুমার ফিরে দাঁড়ালো, চেয়ে দেখলো একবার কেতকীর রহস্যময় কঠিন মুখের দিকে!···কেতকীব চোখের এমন ভয়াবহ রূপ মাত্র একদিন তাব চোখে পড়েছিল—এই সেদিন, যেদিন কেতকী ওর সঙ্গে অকারণ খানিকটা ঝগড়া করলে। আজ সে রূপ যেন আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেচে। কেতকীর সঙ্গে তার পরিচয়-নাট্যের যবনিকা পতন হোলো এইখানেই, এ বিষয় সুকুমারের মনে কোন সংশয় রইলো না। অভিভূতের মতো কেতকীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুকুমারের হঠাৎ মনে হোলো, আর কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কেতকীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে ওর আরক্ত, ভয়াবহ মুখের উপর পাঁচটী আঙ্গুলের স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাওয়াও বোধ হয় সুকুমারের পক্ষে অসম্ভব হবে না। কিন্তু সুকুমার নিজেকে সংযত করতে জানে। তাই কেতকীর দিকে চেয়ে সুকুমার কেবল বললো: পরের উপদেশ অনুসারে চলা আমার রীতির বাইরে। আমি বাড়ী চললাম কেতকী—

সুকুমারের পদশব্দ বারান্দায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো।

আর কেতকী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক সেইখানে। তার মুখের সেই কঠিন, হিংস্র ভাষা এখনও মুছে যায় নি, কিন্তু চোখের তীব্র দৃষ্টি ম্লান হয়ে এসেচে, শিথিল হয়ে এসেচে তার গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গি—

সুকুমার ফিরে এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল এবং সেইখানে দাঁড়িয়েই বললে: যে কথাটা বলবার জন্যে এসেছিলাম, সেটা বলে যাওয়াই ভাল। দিন কয়েকের জন্য বাড়ী যাচ্চি—সুতরাং এ ক'টা দিন অন্ততঃ ললিতাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তোমার হবে না।

কণ্ঠস্বরে পাছে কান্নার আভাস মেলে, কেতকী সেই ভয়ে কথার জবাব দিতে পারলে না। তেমনি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সুকুমার অপেক্ষা করলে এক মিনিট্···দু' মিনিট্। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে এতটুকু সাড়া এলো না।

'আচ্ছা, নমস্কার—' বলে সুকুমার দ্রুত পায়ে বারান্দা পার হয়ে গেল।

আর কেতকী এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ইটালিয়ান 'রাগ'খানা টেনে দিলে গায়ে—কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে গরম যেন অসহ্য হয়ে উঠেচে। খোঁপার কাঁটাগুলি খুলে ফেলে এলো করে বাঁধলো। বেড্-সুইচ টিপে ঘরটা করলে অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষোভে এবং লজ্জায় তার দু চোখের অশ্রুর উৎস যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো!

হোষ্টেলে থাকতে সুধাংশুর কাছ থেকে লীলা একখানি চিঠি পেল। সুধাংশু লিখেচে :

সুচরিতাসু,—

হোষ্টেলে যাবার খবরটুকু পেয়েছিলাম, কিন্তু তার পর থেকে আপনার দেখা আর পেলাম না। হঠাৎ কি ব্যাপার? প্রতিদিন বিকালে আমার বারান্দায আপনার জন্যে অপেক্ষা করি, চা-পানের সময়টুকু নিয়মিতভাবে পার হযে যায, আপনি আর আসেন না। হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেললাম কি না তাও বুঝতে পারচি না। শ্রীমতী কেতকীদের ওখানে গিয়েছিলাম কাল। কিন্তু সেখানেও তো আপনি হোষ্টেলে এসে পর্য্যন্ত যান নি। ললিতা দেবী বেশ সেরে উঠেচেন, কিন্তু তাঁকে ভারি বিমর্ষ দেখালো। শ্রীমতী কেতকীর সঙ্গে দেখা হয নি। শুনলাম, তাঁকে ইদানিং বাড়ীতে পাওযাই মুস্কিল। সমস্ত দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। তরুণী-সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' অভিনয করবে, তিনিও সেই হুজুগে মেতেছেন। সুকুমার বাবু আসেন না, অনুপমবাবুও না। দক্ষিণাবাবু বসে বসে 'পেসেন্স' খেলচেন দেখলাম। বাড়ীটার যেন হতশ্রী দশা হয়েচে আর এই করুণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শ্রীমতী ললিতার ভারি বিশ্রীভাবে দিন কাট্‌চে। যান না কেন ওদিকে?

চিঠি পেয়ে যদি সম্ভব হয, একবার এদিকেও আসবেন। সত্যি, ক'দিনই বা আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিন্তু এরি মধ্যে নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করচি। আপনাকে বাদ দিয়ে হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের এই ফ্ল্যাট যে আমার কাছে কতখানি নিঃসঙ্গ তাও যেন এতদিনে আবিষ্কার করলাম। আমার চিঠি পেয়ে আপনি বোধ হয় মনে মনে হাসচেন খুব, কিন্তু উপায় কি বলুন! এ চিঠি আপনাকে না লিখে পারলাম না। আমার পৃথিবীতে এতদিন

কতকগুলো শুকনো আদব-কায়দা ছাড়া আর কিছু ছিল না, ওজন করে কথাবার্ত্তা বলতাম, বেশভূষার পারিপাট্য ছিল আমার কাছে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ; আপনি এসে সব বদলে দিলেন। আমার প্রতিদিনকে দিলেন নূতনতর রূপ এবং আমার স্বপ্ন ও কল্পনাকে দিলেন মধুরতর ভাষা। বাংলা লিখি নি কতদিন, কিন্তু দেখুন, কেমন কবিত্ব করে চিঠি লিখলাম। কাল সন্ধ্যায় আপনার আসা চাই—আমি অন্যান্য এনগেজমেণ্ট বাতিল করলুম। আসবেন, আসবেন, আসবেন। ইতি

আপনার

হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের ভ্যাগাবণ্ড

এমনি একখানি চিঠিই লীলা সুধাংশুর কাছ থেকে প্রত্যাশা করছিল, সুতরাং লীলা বিস্মিত হোলো না, মনে মনে খুসী হয়ে উঠলো। ইচ্ছে করেই কদিন ও হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে যায় নি, নইলে এতদিনে অন্ততঃ একবার ওদিকটায় ঘুরে আসতে পারতো। চিঠি পাবার পর লীলা ঠিক করে ফেললো যে সুধাংশুর অনুবোধ সে রাখবে। একটু সকাল সকাল যাবে বলে হোষ্টেলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে রাখলো।

পরদিন বিকালে লীলা যখন সুধাংশু মিত্রের ফ্ল্যাটে এসে পৌছলো, তখন বেলা চারটে। সুধাংশু শুযে শুযে বই পড়ছিলো।

লীলা বাইরে থেকে বললে: আবার চেরো নিয়ে পড়েচেন বুঝি?

সুধাংশু ধড়মড় করে উঠে বসলো।

—আসুন, আসুন, এত সকালে আপনি আসবেন, ভাবতেই পারি নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে লীলা বিছানার প্রান্তে বসলো। সুধাংশু বললে, কেমন ছিলেন এ ক'দিন? বেশ ভালো নিশ্চয়ই?

সত্যি ভাল ছিলাম, অনেকদিন পরে হোষ্টেলে ফিরে ভারি চমৎকার লাগচে।

আপনার সৌভাগ্যকে হিংসে করতে হয়। আমার দিনগুলো যে খুব স্বচ্ছন্দে কাটচে না তাতো চিঠিতেই প্রমাণ।

লীলার মুখে হাসির রঙ লাগলো। বললে: আপনি এমন গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারেন তা জানতাম না।

সুধাংশু হেসে বললে: ছেলেবেলা থেকে রীতিমত আর্ট হিসেবে চিঠি লেখার চর্চ্চা চলেচে—কিন্তু কোন কাজে লাগলো না।

এরি মধ্যে হতাশ হয়ে পড়লেন?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুড়ো হতে আর বিলম্ব নেই।

ওটা ভুল মনে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কতজনকে কতগুলো চিঠি লিখেচেন বলুন তো?

সুধাংশু বললে: ভয়ে না নির্ভয়ে?

সম্পূর্ণ নির্ভয়ে।

একটু চুপ করে থেকে সুধাংশু বললে: সত্যি অনেক চিঠি লিখেচি। ছেলেবেলা থেকে মাথার উপব শাসনেব দণ্ড ছিল না—প্রেমেব স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলাম চোদ্দ বছর থেকে। তখন আপনাদেব উদ্দেশ্য করে কেবল চিঠি লিখতাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিঠি—ছ' পাতা থেকে এক ফর্ম্মা পর্য্যন্ত। শেলী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বড় বড় কবিদেব লাইনগুলো বেমালুম নিজের বলে চালিয়ে দিতাম। কিন্তু জবাব মিলতো না কারও

কাছ থেকে—কারণ যাঁদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতাম তাঁদের সবাই ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে বড়।

সকৌতুক আগ্রহে লীলার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো; বললে: বলুন, তারপর?

সুধাংশু বললে, তারপর বয়স যখন আঠার-উনিশ তখন এ রোগ একেবারে ছেড়ে গেল। থাকতাম পড়াশুনো নিয়ে, মোটর নিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তাম বিদেশে···কিন্তু এবার সুরু হোলো প্রতিক্রিয়া, যাকে বলে পাণ্টা আক্রমণ। পরিচয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, সন্ধ্যেগুলো কাটতে লাগলো ড্রয়িংরুমের খিল খিল হাসি আর পিয়ানোর টুং টাং শুনে। অযাচিত ভাবে চিঠি পেলাম অনেক, কোনটি উগ্র সুরার মতো ঝাঁঝালো, কোনটি হাসনুহানার গন্ধের মতো উদাস-করা। অনেকে হয়তো ঠকলো এবং কেউ কেউ গেল ঠকিয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে যত্ন করে রেখেচি মাত্র একখানি চিঠি। দেখবেন সেখানা?

—আত্ম-নিবেদনের ভাষায় সেখানে বুঝি আর সবাইকে পরাস্ত করেচে?

—এক হিসেবে তাই বটে। পড়ে দেখুন না···

সুধাংশু উঠে গিয়ে আলমারির ড্রয়ার থেকে একতাড়া চিঠি বা'র করে লীলার সামনে খাটের উপর ফেলে দিলো।

লীলা বললে, একি জজের কাছে স্বীকারোক্তি নাকি সুধাংশুবাবু? কিন্তু এগুলোর পাঠ উদ্ধার করতে যে অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক সময় দরকার।

সুধাংশু লীলার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইলো; তারপর বললে—আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন রাখতে চাই না।

'কিন্তু আমি আপনার সব কথা জেনে নেব কোন্ অধিকারে?'—লীলা বললে।

—কোন অধিকার না থাকলে এগুলো আপনার সামনে এমন অনায়াসে ফেলে দিতে পারলাম কি করে? কিন্তু তর্ক থাক লীলাদেবী। এর সবগুলো আপনাকে আমি পড়তে বলি নি। কেবল নিচের ওই নীল লেফাফাখানা খুলে পড়লেই চলবে। ভারি মজার চিঠি!

লীলা নীল খামখানি খুলে ফেললো। ইলার চিঠি। কিন্তু আদ্যোপান্ত পড়েও লীলা এর অর্থভেদ করতে পারলে না। বললে, এ চিঠি তো অন্যের, আমায় দিলেন কেন?

সুধাংশু বললে, চিঠিখানা আমার নয় সত্যি, কিন্তু এসেছিল এই ঠিকানায়, খামের ওপর দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবেন। ভিতরে আমার নাম দেখে ধরে নিতে পারেন যে মেয়েটিকে আমি জানতাম। ভালবাসবার ভরসাও পেয়েছিলাম ওতরফ থেকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চিঠি পোষ্ট করবার সামান্য একটী ভুলে ব্যাপারটা বিয়োগান্ত হয়ে দাঁড়াল। আগেকার দিনে ভুল করেও 'কমেডি' ঘটতো, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা Tragedy of Errors. এর পর আমার চিঠি লেখার বাতিক একেবারে দূর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু···

সুধাংশু হঠাৎ চুপ করে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। লীলা তার অদ্ভুত আয়ত দৃষ্টি সুধাংশুর মুখের উপর মেলে ধরে বললে,···কিন্তু হঠাৎ কি হোলো বলুন তো?

সুধাংশু হতাশভাবে হাত পা মেলে ডেক-চেয়ারখানায় বসে পড়ে বললে: নাঃ! আপনার কাছে সিরিয়াসলি কোন কথা বলাই দায়!

লীলা চুপ করে রইলো কতক্ষণ—তার চোখ দুটী আরও গভীর,

আরও রহস্যময় হয়ে এলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে: সত্যি সুধাংশুবাবু, চিঠি সম্বন্ধে আপনার ভয় আজ যতখানি, সিরিয়াস প্রেম-নিবেদন সম্বন্ধে আমার ভয়ও বুঝি তার চেয়ে কম নয়।

সুধাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলো; কাছে এসে লীলার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে: বিশ্বাস করুন—চিঠিগুলো আপনার সামনে বার করে আমি আত্মপ্রচার করতে চাইনি—আমায় ভুল বুঝবেন না।

লীলা সুধাংশুর কথার কোন জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো··· হঠাৎ যেন ও পাথর হয়ে গেছে, যেন স্ফিঙ্ক্সের মতো অদ্ভুত কোন মূর্ত্তি!

সুধাংশু ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সত্যি, লীলার মুখের এমন কঠিন চেহারার সঙ্গে তার ইতিপূর্ব্বে কোনদিন পরিচয় ঘটে নি। এ যেন লীলা নয়, আর কেউ! সুধাংশু মেঝের উপর বসে পড়ে লীলার দুটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিলো, তারপর বললে: আমি কি অন্যায় করলাম বলুন, বলতেই হবে আপনাকে।

লীলা এবার কথা বললে: অন্যায় আপনি করেন নি সুধাংশুবাবু, করেচি আমি। উঠুন, আমি যাই।

সুধাংশু বললে, এখনও পাঁচটাও বাজে নি, আপনি যেতে চাইচেন কেন? কি হয়েচে বলুন?

লীলা কিন্তু সুধাংশুর অনুরোধ উপেক্ষা করলে, তার হাত দুখানি ধীরে ধীরে সরিয়ে এনে উঠে দাঁড়ালো; বললে, আপনার সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে আমি অন্যায় করেছিলাম। আমায় ক্ষমা করবেন।

লীলা ঘর ছেড়ে বাইরে আসবার উপক্রম করলো। কিন্তু সুধাংশু তাকে আসতে দেবে না; পথরোধ করে দাঁড়াল সুধাংশু, বললে: এমনি

করে আপনাকে আমি চলে যেতে দেব না, কিছুতেই না। সব কথা আপনাকে বলে যেতে হবে। আঘাত সহ্য করার অভ্যাস আমার আছে, তার প্রমাণ আমি আজই আপনাকে দিয়েচি।

লীলা বললে, অনেক দুঃখই আপনি মুখ বুঁজে সহ্য করেচেন, সে কথাও আজ বুঝতে পেরেচি—কিন্তু তার বোঝা আর বাড়াবেন না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, যে মনের দিক দিয়ে আমি বুঝি ইলার চাইতেও ছোট!

সুধাংশু বললে, আপনি আমায় ভুল বোঝাতে চাইচেন, আমি এত সহজে তা মেনে নিতে রাজী নই।

লীলা আবার অল্পক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো—ঘড়ির টিকটাক শব্দ ছাড়া প্রকাণ্ড ঘর একেবারে স্তব্ধ; আগ্রহ-আকুল দৃষ্টি নিয়ে সুধাংশু লীলার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দু'টির দিকে চেয়ে আছে—কি জানি, কি কথা বলবে লীলা!

কতক্ষণ পরে লীলার ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠলো; তারপর ধীরে ধীরে বললে—ছেলেবেলা থেকে আমি স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছিলাম সুধাংশুবাবু। অভিভাবকের মধ্যে এক দাদা, কোন দিন তিনি আমায় শাসন করবার কথা ভাবতে পারেন নি। তাঁর ভালমানুষীর সুযোগ আমি নিয়েছিলাম পূর্ণমাত্রায়। এই কলকাতায় থাকতেই তিনি যখন ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের দলে মিশে কুলীদের বস্তিতে বস্তিতে,কারখানায় কারখানায় ঘুরে বেড়াতেন, আমি তখন মনের মধ্যে রীতিমত রোমান্সের কল্পলোক গড়ে তুলেচি। বয়স তখন সতেরোর বেশী হবে না, সবে কলেজে ঢুকেচি। আমাদের সে কলেজে ছিল ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াবার ব্যবস্থা। ক্লাসে যাতায়াতের সময় একটি ছেলেকে প্রতিদিন মুগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখ্‌তাম…

সুধাংশু কৌতূহলে অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলো, বলুন, বলুন—ছেলে বয়সে এমন ছেলেমানুষী আমরাও কম করিনি।

লীলা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে : এটা কিন্তু ছেলেমানুষীর চেয়ে কিছু মারাত্মক। এখন থেকে মন্তব্য করবেন না, বলতে দিন আমায়।—আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে সেদিন তার কি দুঃসাধ্য চেষ্টা ছিল, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমি জানতাম সে বড়লোকের ছেলে, বাড়ী, গাড়ী এবং ট্যাক্সি ভাড়ার টাকা কিছুরই অভাব তার নেই। তবু বৃষ্টির দিনে জলে ভিজে তার ক্লাসে আসা চাই। আমি ক্লাসে পৌছবার আগে কোনদিন ও ঘরে ঢুকতো না। আমি সীট্ দখল করে বসবার পর ওকে যেতে হবে আমার সামনে দিয়ে—এমনি নানা উপদ্রব। একদিন বাস থেকে নেমে কলেজে আসবার পথে তার সঙ্গে দেখা হোলো। সেদিনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়চে। দেখলাম, কলেজের খানিকটা আগেই সে ঘরের গাড়ী থেকে নেমে পড়লো এবং ভিজতে ভিজতে এগিযে চললো কলেজের দিকে। কাছাকাছি এসে পড়তে জিজ্ঞাসা করলাম—'গাড়ী থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে কলেজে চলেচেন যে?' আমার সঙ্গে এমনি ভাবে পথে দেখা হবে ভাবে নি, ও একটু বিব্রত হলো। সে কিন্তু এক মিনিটের বেশী নয়। মাথার এলোমেলো চুলগুলো বেয়ে কপালের উপর টপ টপ করে জল পড়ছিল; হাতের রুমাল দিয়ে সেগুলো মুছে ফেলতে ফেলতে সে বললে—'বললে হয় তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এর কারণ আপনি নিজে।'

সুধাংশু একেবারে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো : ব্রাভো, ব্রেভ ল্যাড্!

লীলা বললে : হাঁ—বিংশ শতাব্দীর রোমিয়ো।…আমি বললাম, 'কিন্তু আদ্য পথে এভাবে দেখা না হলে সে কথা আমায় জানাতেন কি করে ?' কথা বলবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ ; সপ্রতিভ ভাবে হেসে জবাব দিল—'ঠিক জানতাম, সুযোগ একদিন ঘটবেই। আপনার কোষ্ঠীর গ্রহগুলোর সঙ্গে আমার কোষ্ঠীর গ্রহগুলোর একদিন দৈবাৎ ধাক্কা লাগতোই—এই দেখুন না যেমন আজকে।'.. আমাদের আলাপের গোড়ার কথা এইখানেই শেষ।

সুধাংশু বললে, কিন্তু শেষ কথা শেষ হতে এখনও অনেক দেরি, এটুকু যেন বুঝতে পারচি। হোক দেরী, ঘড়ির দিকে আজ তাকাবো না। কিন্তু গল্পের যিনি নায়ক, তাঁর নাম একটা দেওয়া চাই, নইলে রূপকথার গন্ধ থেকে যায় সমস্তটার মধ্যে। যা হয় একটা নামকরণ করুন।

লীলা বললে, বেশ তাই হোক। ধরে নিন তাঁর নাম মিষ্টার এক্স—

তাতে আমি নারাজ। গল্প বলবেন বাংলায়, তার মাঝখানে ওই খটমট কথাটা ভারি বেমানান।

তাহলে বলা যাক—'ক'বাবু।

বাবু বর্জ্জিত নাম দিন—নইলে ছেলেটির প্রতি অবিচার করা হবে।

হোক অবিচার, কিন্তু তাই বলে আসল নামটা তার সত্যিই শুনতে পাবেন না। তার দরকারও নেই মোটে।…আচ্ছা, বলা যাক, তার নাম ছিল সিতাংশু।

সুধাংশু হতাশার ভঙ্গি করে বললে,—and so close to mine ! তা হোক, ওতেই আমাদের কাজ উপস্থিত চলে যাবে। সুরু করুন,—

লীলা বললে, সুরুর কথা এতক্ষণ বললাম। তারপর মাঝখানটা

নিতান্ত মামুলী, অর্থাৎ, ক্লাসের বাইরে প্রতিদিন দেখা, পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব এবং বন্ধুত্ব থেকে ঘনিষ্ঠতা। এবার শেষ কথাটাই বলি আপনাকে। কথাগুলো যদি কিছু স্পষ্ট মনে হয় সে অপরাধ কিন্তু নেবেন না।

সুধাংশু বললে, মাভৈঃ! I am sport for it. বলুন—

সব কথা কিন্তু অনায়াসে বলা চলে না, কোথায় যেন সঙ্কোচের একটু জড়িমা থেকে যায়!—

লীলাও তাই হঠাৎ গল্পের সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে পারলো না। হাজার হোক, সেই তার জীবনের প্রথম গল্প।

সুধাংশু লক্ষ্য করলে; বললে, কোথায় যেন বাধচে আপনার, থাক ও গল্প লীলা দেবী—

লীলা এবার যেন সজাগ হয়ে উঠলো; বললে, ওটা মেয়েদের স্বভাবের দোষ সুধাংশুবাবু, অনেক বাধা ছিঁড়ে এগিয়ে এসেও কোথায় যেন কুণ্ঠার বালাই রয়ে গেছে। তবু যে গল্প আপনার কাছে সুরু করেচি তা শেষ না করে উঠবো না। তিন বছর আগের কথা, গল্পের খেইগুলো সব এলোমেলো হয়ে এসেচে, একটু ভেবে নিতে দিন।

সুধাংশু এবার কোন কথা বললে না; বলবার সাহস পেলে না বোধ হয় লীলার চোখের দিকে চেয়ে! স্মৃতি না কাঁটা কি দেখলো ও লীলার চোখে কে জানে?

মিনিট কয়েক নিস্তব্ধ থেকে লীলা বললে, সিতাংশুর সঙ্গে আমার পরিচয় যেমন হঠাৎ, তার শেষও ঠিক তেমনি। দু জনের পরিচয় যখন একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেচে, তখন যেন মনে হতে লাগলো, সিতাংশু আমায় সন্দেহ করতে সুরু করেচে। যেখানে তার চোখে দেখতাম উৎসাহের

আলো, সেখানে যেন কুটীল সংশয়ের ছায়া পড়লো। কারণ ছিল একটু। ম্যাথামেটিক্‌সের অধ্যাপক দেবেন রায়ের সঙ্গে কলেজের বাইরে আমার আলাপ ছিল, নিতান্ত নির্দ্দোষ পরিচয়। মধ্যে মধ্যে কঠিন অঙ্কগুলো দেখিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাড়ী যেতাম। কথাটা কি করে যেন সিতাংশুর কাণে পৌছলো। সেদিন তার চোখমুখের উচ্ছৃঙ্খল চেহারা দেখে আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কলেজ শেষ হবার পর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যখন ওর সঙ্গে দেখা হলো তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েচে তোমার? কাল সারারাত্রি ঘুমোওনি বুঝি?' সিতাংশু বললে, 'সত্যিই ঘুমোই নি। রাত বারটা পর্য্যন্ত ছিলাম ক্যাসানোভায়, সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে ষ্ট্রাণ্ডে ঘুরে বেড়িয়েচি কতক্ষণ, তারপর একসময় গাড়ী রেখে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—পুলিস গাড়ী শুদ্ধ নিয়ে গিয়েছিল থানায়...' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি হয়েচে তোমার, হঠাৎ কাসানোভায় গিয়ে মাতাল হতে গেলে কেন?' সিতাংশু বললে—'আত্মহত্যা করলে সুখী হতে বুঝি?' বললাম, 'তার মানে?' 'তার মানে তুমি নিজে'—সিতাংশু বলে উঠলো। মানে ক্রমশঃ স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম। ওর কোন্ বন্ধু বুঝি পরপর দুইদিন আমাকে প্রফেসর রায়ের বাড়ী থেকে সন্ধ্যের পর আসতে দেখেচে। সিতাংশু বললে, 'তুমি কেন ওই হতভাগাটার বাড়ী যাও শুনি?' 'পড়তে।'—আমি বললাম। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করবে কে! সিতাংশু বললে—'তুমি সেখানে যাও আমি এটা চাইনে লীলা। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা যেন আমাকে শুনতে না হয়।' আমার কাছে সিতাংশু তখন মানুষের চেয়ে বড়ো, কি না পারতাম সে দিন তার জন্যে, রাজী হলাম তার কথায়, প্রফেসর রায়ের বাড়ী গিয়ে আঁককষা বন্ধ হোলো সেই দিন থেকে। কিন্তু সিতাংশুর মনের

কোণের পচা ঘা মিলোলো না। একদিন তার দুর্গন্ধে আমাকেও অস্থির করে তুললে।"

লীলা ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলতে লাগলো :

আমাকে প্রফেসর রায়ের ভাল লেগেছিল, এ কথা আমি আগে জানতে পারি নি। অঙ্ক কষতে যাওয়া বন্ধ করতেই দিন কয়েক পরে তাঁর কাছ থেকে ছোট একটা চিঠি পেলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কতখানি আগ্রহ নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন, আমি এই কদিন ওঁদের ওখানে না যাওয়ায় তা'র সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ কি রকম কদাকার হয়ে গেচে, এই সব কথা তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন। ভবিষ্যতে যাতে তিনি এমনি চিঠি লিখে আমায় বিব্রত না করেন সে কথা জানিয়ে তাঁ'কে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা নিজে পোষ্ট করবো মনে করে পথে বেরিয়েচি, প্রেতের মতো সিতাংশু এসে দাড়ালো সামনে! হঠাৎ তাকে দেখে আশ্চর্য্য হওয়ায় চিঠিখানি লুকোবার কথা ভাবতে পারিনি, সেটা স্পষ্ট সিতাংশুর চোখে পড়ে গেল। ক্ষেপে যাওয়ার মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সিতাংশু বললে, 'অনর্থক এতদিন তোমায় বিব্রত করেচি লীলা, প্রফেসরের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা এত বেশী সে কথা জানতাম না।'

বুঝলাম একমিনিটের মধ্যে তার মাথায় অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়ে গেচে। বললাম—'আমায় তুমি ভুল বুঝো না। চিঠিখানা ইচ্ছে হলে তুমি খুলে পড়ে দেখতে পারো।' কিন্তু ঈর্ষার আগুণ তখন তার ভাববার শক্তিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েচে। সিতাংশু বললে—'অপরের কাছে লেখা প্রেমপত্র পড়ে দেখি এতখানি ধৈর্য্য নিয়ে আমি জন্মাইনি লীলা। দাও তোমার চিঠিখানা—' হাত থেকে চিঠিখানা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সিতাংশু ডাকবাক্সের মধ্যে ফেলে দিলে। সামনে দিয়েই চলেছিল খালি

একখানা ট্যাক্সি। হাত তুলে সেটাকে থামবার আদেশ দিয়ে ব্যঙ্গকণ্ঠে সিতাংশু বললে : গুডবাই লীলা, প্রফেসর রায়ের বিয়েতে যদি নিমন্ত্রণপত্র পাই তাহলে দামী একটা প্রেজেণ্ট পাঠাবার চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই।— আপাততঃ এইখানেই শেষ।'

সিতাংশুর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। এর পর থেকে সে কলেজেও আর আসেনি। শুনেচি ট্রান্সফার নিয়ে এলাহাবাদের দিকে কোথায় চলে গিয়েছে—

গল্প বলা শেষ হতে লীলা চুপ করে বসে রইলো। উচ্ছ্বাসের মাত্রা যথাসম্ভব বাদ দিয়েই লীলা তার গল্প শেষ করেচে, তা হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওটা প্রেমের গল্প এবং লীলার মুখে তার প্রথম প্রেমের গল্প সুধাংশুর কাণে নিশ্চয়ই মধুর লাগে নি। সুধাংশুও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো।

কয়েক মিনিট এমনি ভাবে কাটবার পর লীলাও যেন আবার সহজ করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলো। মৃদু হাসির সঙ্গে লীলা বললে, রাগ করলেন না কি সুধাংশুবাবু আমার গল্প শুনে?

সুধাংশুও হাসবার চেষ্টা করলো এবং বললো, তা' হলে চিঠিগুলো দেখে আপনিও কম রাগ করেন নি বোঝা যাচ্ছে!

লীলা বিষয়টীকে হালকা করে দেবার জন্যে বললে, তা হলে আমরা অন্যায় দুজনেই করেচি বলুন; কিন্তু কে কার অন্যায়ের বিচার করবে?

সুধাংশু বললে, তার চেয়ে দু'জনে একটা রফা হওয়াই ভালো, কি বলেন?

'সেই ভাল'—বলে লীলা চুপ করলো।

সুধাংশুও আর কথা বলবার উৎসাহ পেলে না। সত্যি, আজকের

সন্ধ্যাটিকে কল্পনায় সে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে রেখেছিল, লীলার কোন্ কথার উত্তরে কি বলবে, দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ধরে শুধু সেই সব কথাই ভেবেচে। মোটরখানা নিয়ে আজ উইলিংডন ব্রীজের দিকে তারা বেড়াতে যাবে, তারপর, চতুর্দ্দশীর স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায ব্রীজের রেলিংএ ভর দিয়ে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সুধাংশু কেমন করে তার আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্য একেবারে উজাড় করে দেবে, মনে মনে তার মহলা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল অনেকবার। কিন্তু এখন ঘনায়মান সন্ধ্যার এই অস্পষ্ট অন্ধকারে, সুধাংশুর হঠাৎ মনে হতে লাগলো, তাদের মাঝখানে যেন দুস্তর ব্যবধান, আর সেই ব্যবধানের মধ্যে মরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া অতীতের প্রেত, দাঁড়িয়ে আছে তার কুৎসিত কবন্ধ নিয়ে।·· কিন্তু সুধাংশু এত সহজে হটে যেতে রাজী নয়, লীলার জীবনে যা অতীত তাকে সে অনায়াসে ভুলে যেতে পারবে, অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস তার আছে। ভয় পাবে না সুধাংশু, আত্মবীর্য্যে বিশ্বাস সে হারাবে না। আপনার প্রেম ও কল্পনা দিয়ে, ঐশ্বর্য্য ও উৎসাহ দিয়ে লীলার মনের ক্ষত অনায়াসে ও সারিয়ে তুলতে পারবে।

সুধাংশু হঠাৎ লীলার কাছে উঠে এলো। ধীরে ধীরে তার একখানি হাত কোলে তুলে নিয়ে বললে, একটা কথা আপনাকে বলবো মনে করছিলাম, বলুন রাগ করবেন না।

স্নেহস্নিগ্ধ, আর্দ্রকণ্ঠে লীলা বললে: না, বলুন।

সুধাংশুর কণ্ঠস্বর আবেগ ও অনুভবে গভীর হযে এলো, সে বলতে লাগলো—এই মাত্র ভাবছিলাম আপনার ও আমার জীবনের আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কথা। জীবনে দুজনেই আমরা আঘাত পেয়েচি, আর তার মূলে আছে দু'খানা চিঠি, আশ্চর্য্যের কথা নয়, বলুন? তবু, আমাদের

এই সামান্য ক'দিনের পরিচয়, সেই পুরান ইতিহাসকে পিছনে রেখে এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেচে। জীবনে যদি সে পরিচয়কে স্থায়ী করবার সুযোগ ঘটে, তা'হলে দু'জনেই বোধ হয় বেঁচে যাব! আপনার কি ঠিক তাই মনে হয় না?

লীলার শান্ত, আবেগ-হীন কণ্ঠ শোনা গেল : না।

সুধাংশু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলো লীলার মুখের দিকে, হঠাৎ কথা বলতে পারলো না।

লীলা বললে : আপনি প্রথমেই আজ এ কথা বলবেন, এ আমি জানতাম সুধাংশুবাবু। তাইতো খুঁজে দেখলাম আপনার অতীতটা এবং নিজের কথাও আপনাকে খুলে বলতে এতটুকু ইতস্ততঃ বোধ করিনি। কিন্তু এখন কি মনে হচ্চে জানেন? ঘর বাঁধবার সহজ সরল মসৃণ পথ আমাদের নয়। বুদ্ধি দিয়ে, বিচারশক্তি দিয়ে নিজেদেব আমরা যত বেশী উদার প্রমাণ করবার চেষ্টা করবো, পরস্পরকে আমরা ঠকাবো ঠিক ততখানি। আপনার ও আমার গভীরতম মিলনের মুহূর্ত্তে হঠাৎ আসবে সন্দেহের প্রেত-ছায়া, বিষিয়ে তুলবে আমাদের শয্যা, বিষিয়ে তুলবে আমাদের রাত, বিষিয়ে উঠবে আমাদের জীবন। ভালবাসতে গিয়ে আমরা পরস্পরকে শুধু আঘাত করবো, অপমান করবো, ইতব লোকের মতো করবো সামান্য কতকগুলো বিষয় নিয়ে অকাবণ, অর্থহীন কথা কাটাকাটি···না, না, সুধাংশুবাবু সে আমি পাববো না।

কথা শেষ করে লীলা যেন মনে মনে শিউরে উঠলো। সুধাংশু কোন কথা বললে না, লীলার হাতখানি কখন তার শিথিল মুঠি থেকে বিছানার উপর নেমে এসেচে; খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশু সমস্ত ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে সন্ধ্যার ছায়া

নিবিড় হয়ে এসেচে, ঘরে এখনও আলো জ্বালা হয় নি, সেই অন্ধকারের মধ্যে সুধাংশুকে ঝড়ের রাতে ঢেউয়ের মুখে নিঃসঙ্গ নৌকার মত অসহায় মনে হোলো! মনে হোলো আজকের রাতের চতুর্দ্দশীর চাঁদ হঠাৎ মেঘের দেশে পথ হারিয়ে ফেলেচে, চাঁদ উঠবে না, কুয়াসার ওড়না ছিঁড়ে আজ রাতে চাঁদ আর উঠবে না, চাঁদ মরে গেছে, চাঁদ গেছে হারিয়ে!

অন্ধকারের মধ্যে লীলার কণ্ঠস্বর আবার সুধাংশুর কাণে এসে পৌছল: স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা আমাদেব সহ্য হবে না সুধাংশুবাবু, কিন্তু বন্ধু হতে আমরা পারি। ক্ষতি কি তা'তে?

তেমনি অস্থির পদবিক্ষেপে ঘবময ঘুরে বেড়াতে বেডাতে সুধাংশু বললে: লাভ ক্ষতির হিসেব এখন কে করবে? সব যেন গোলমাল হযে যাচ্চে। একজন গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, আমাব বিযে কোন দিন হবে না, আর যদি বা হয, তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে আমি গলা টিপে খুন করবো। সেদিন জ্যোতিষী ঠাকুরের কথা শুনে বেশ খানিকটা হেসে নিয়েছিলাম মনে আছে, কিন্তু তোমাব কথা শুনে আজ মনে হোলো, হযতো সেই দুষ্কীর্ত্তির হাত থেকেই তুমি আমায বাঁচালে!...এতখানি সহজ করে দুজনে যখন দুজনকে জানলাম, তখন অন্ততঃপক্ষে 'আপনি' সম্বোধনের আড়ালটা ঘুচিয়ে দেওযা দরকার, তুমি কিছু মনে করো না লীলা।

না। কিন্তু আপনি কি বন্ধুত্বটুকু দিতেও নারাজ?

স্ত্রীলোকে আর পুরুষে নিছক বন্ধুত্বেব কোন অর্থ হয কি না জানিনে লীলা, তবু রাজী, তোমার কথায় আমি রাজী। কিন্তু বন্ধুত্বেব কোন্ বিধানে বন্ধুকে তুমি বলা যায় না, সেটা তুমি এখনও বলো নি।

লীলার চোখের কোনে টলমল করে উঠলো মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা

জল ; ভাগ্যে, ঘর অন্ধকার, সুধাংশুর লক্ষ্য ছিল না সে দিকে ; আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছতে মুছতে প্রার্থনার মন্ত্রের মতো লীলা শুধু বারম্বার বললে : তুমি ! তুমি !···হোলো তো এইবার ?···

অনেকদিন পরে আমরা দক্ষিণা-নিবাসে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু গল্পের গোড়ায় এ বাড়ীর যে রূপ আমরা দেখেছিলাম, তা যেন কোথায় আত্মগোপন করেচে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় ড্রয়িং রুমে উঠতো পিয়ানোর ঝঙ্কার, অপরাহ্ণগুলি লাউঞ্জের ধারে চায়ের পেয়ালা আর চটুল আলাপে হয়ে উঠতো রমণীয় সেখানে আজ অখণ্ড নীরবতা, অস্বস্তিকর। সুকুমার আসে না, অনুপম আসে না, সুধাংশুও না, লীলাও নয়। বাড়ীর মধ্যে এখন মাত্র তিনটি প্রাণী—দক্ষিণাবাবু, কেতকী আর ললিতা। অবনীন্দ্র মাস দুই আগে ছবি তোলবার কাজে নামজাদা এক কোম্পানীর সঙ্গে গেছে রেঙ্গুণ, সুতরাং তারও সম্প্রতি ফিরবার সম্ভাবনা নেই। কেতকী হঠাৎ কলেজের সঙ্গিনীদের নিয়ে মেতে উঠেচে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তারা 'শকুন্তলা' অভিনয় করবে 'নিউ এম্পায়ারে'। তোড়-জোড় চলেচে এখন থেকেই ; স্নান করবার, খাবার সময় পর্য্যন্ত নেই কেতকীর। ললিতার সঙ্গে তার আলাপে ছেদ পড়েছিল অনেক দিন আগেই, এই উপলক্ষে সেটা স্থায়ী হবার উপক্রম করচে। সুকুমার সেই যে বাড়ী গেছে, এখনও বোধ হয় ফেরেনি ;—অন্ততঃ এ বাড়ীতে তার সংবাদ এসে পৌঁছয়নি এখনও। কেতকীর মনে বিশ্বাস ছিল, সুকুমার আবার একদিন আসবেই, সুতরাং তার এই সুদীর্ঘ মৌনতার জন্য মনে মনে যথেষ্ট চিন্তিত হলেও দুঃখের ভারে সে ভেঙে পড়েনি। দক্ষিণাবাবু

কিন্তু রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠেচেন। সমস্ত সকাল-সন্ধ্যা কি যে করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ছেলেবয়সের বন্ধু কোন এক রিটায়ার্ড সব্‌জজের বাড়ীতে বেড়াতে যান, কিন্তু তাতে আর কতক্ষণ সময় কাটে? বই পড়েন রাশি রাশি, তাতেও যেন আগের মতো আনন্দ মেলে না। চিন্তার কীট বাসা বেঁধেচে তাঁর মনের মধ্যে। তার উপর স্থকুমারের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাঁর কাছে রীতিমত রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়। কেতকীর সঙ্গে ওর বিয়ে এই মাসেই দিয়ে ফেলবেন, মনে মনে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যার বিয়ে তার কোন সন্ধান পাওয়াই ভার। আজকালকার ছেলেদের মনের গতিবিধি নির্ণয় করা সত্যিই তাঁর পক্ষে রীতিমত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্চে! উৎসাহও তাদের যেমন, ধৈর্য্যের অভাবও ঠিক ততখানি। বিংশশতাব্দীর ছেলেদের এই লঘুচিত্ততাকে আক্রমণ করে পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠাবেন কি না, এমন কল্পনাও মধ্যে মধ্যে তাঁর মাথায় উদয় হচ্চে!

এদিকে ললিতার জীবনের দিনগুলিও বৈচিত্র্যহীনতায় বিস্বাদ হয়ে উঠেচে। সকাল নটায় সরোজনলিনী'র বাস এসে দাঁড়ায় দুয়োরে, ললিতা যায় লেখাপড়া করতে। সেখানে কয়েকটি ঘণ্টা তবু মন্দ কাটে না। তারপর কর্ম্মহীন সঙ্গীহীন সন্ধ্যাগুলি যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনি বিরক্তিকর। সেলাই নিয়ে কাটে কিছুক্ষণ, বইগুলো নেড়ে চেড়ে হয়তো আরও এক ঘণ্টা, কিন্তু তারপর?

দক্ষিণাবাবু কখনও কখনও ডেকে পাঠান। সমস্ত দিন ধরে কথা বলতে না পাওয়ার প্রতিশোধ নেন তিনি ললিতার উপর। ললিতা তাঁর কথাবার্ত্তার কিছু বোঝে, কিছু বা বোঝে না, কিন্তু ঘুমে চোখ ঢুলে এলেও সমানে সজাগ হয়ে বসে থাকতে হয় দক্ষিণাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে, ভয়ে

ভয়ে হাই পর্য্যন্ত তুলতে পারে না, যদি চোখে পড়ে যায় দক্ষিণাবাবুর! যদি তিনি কিছু মনে করেন—

হঠাৎ এ বাড়ীর আবহাওয়ায় ললিতা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল। চারিদিকের হাসি, গান এবং কলরবের মধ্যে কোথায় যেন ছিল অন্তরঙ্গতার আভাস, গ্রামের সেই জরাজীর্ণ কুটীর পার হয়ে এখানে পৌঁছে ললিতার চোখে লাগলো মোহের ঘোর। ও ভুলে গেল আপনাকে, বসন্তের বাতাসে নব মঞ্জরীর মতো মুকুলিত হয়ে উঠলো মনে মনে, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, বিলিয়ে দেবার বাসনায় ললিতা যেন নতুন করে বেঁচে উঠছিল—পটপরিবর্ত্তন হোলো সেই মুহূর্ত্তে। বহু মানুষের কণ্ঠস্বরে, উগ্র আলো আর বিচিত্র বেশভূষার আড়ম্বরে নাট্যশালা ছিল ঐশ্বর্য্যময়, হঠাৎ আলো গেল নিভে, নাটমন্দির হোলো নীরব। ললিতা যেন নিজেকে খুঁজে পেল আবার। ভাল করে চোখ চেয়ে দেখলে, এক বছর আগেও সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আজও আছে ঠিক সেইখানে। মাঝখানে দিন কয়েকের জন্য ও হয়তো স্বপ্ন দেখে থাকবে—রঙীন স্বপ্ন, মধুর স্বপ্ন!

এই অপ্রীতিকর আত্মচেতনা নিয়ে আরও কতকাল তাকে এ বাড়ীতে থাকতে হবে, সে কথা ভেবে ললিতা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এক একবার মনে হয়, চিঠি লিখবে জয়ন্তদাকে—ভাল লাগচে না জয়ন্তদা এখানে, নিয়ে যান আপনি আমায়; কিন্তু সাহস খুঁজে পায় না নিজের মধ্যে। যাবার পথ খোলা আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সে পথ কত দূরে শেষ হয়েচে কে জানে, গন্তব্যের ঠিকানা কোথায় তার?

ললিতা পথ খুঁজে পায় না।

এমনি করে কাটলো দিন কতক, তারপর হঠাৎ একদিন সামান্য

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বাড়ীর আকাশে যে ঝড়ের আভাস বহুকাল ধরে আসন্ন হয়েছিল, তা একেবারে সবাইকে সচকিত, উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো। ছোট একটি ঘটনা অকস্মাৎ এই গল্পের পরিণতিকে নিয়ে গেল আর এক পথে।

সেদিন কেতকীদের 'শকুন্তলা' অভিনয় হবে নিউ এম্পায়ারে। কেতকী ঘুম থেকে উঠেছিল কোন্ সকালে। তারপর সমস্ত দিনটা তার ঘরের মধ্যে ভূমিকা আবৃত্তি করতেই কেটে গেল এবং বিকাল চারটা বাজবার পূর্ব্বেই সে বেরিয়ে পড়লো কলেজের উদ্দেশ্যে—কলেজ থেকেই এক সঙ্গে তাদের থিয়েটারে যাবার কথা। অভিনয় দেখবার জন্য কেতকী ললিতাকে অনুরোধ করবে, এমন আশা ললিতা করে নি, সুতরাং কেতকী চলে যেতে সে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হোলো না। এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়ে, একা একা সন্ধ্যাগুলি কাটানো তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ললিতা নিজের ঘরে বসে কার্পেটের উপর ফুল তুলছিল, দক্ষিণাবাবু এসে বললেন, আমি রমেশের বাড়ী চললাম মা, খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেচে রমেশ, ফিরতে রাত প্রায় নটা হবে।

রমেশ দক্ষিণাবাবুর বন্ধু—রিটায়ার্ড সব্ জজ। এমন খাওয়া দাওয়ার আয়োজন তিনি মধ্যে মধ্যে করেই থাকেন এবং কেতকীও যে সব সময় বাড়ী থাকে তাই বা কে বললে? একা একাই কাটাতে হয় ললিতাকে। সুতরাং ললিতার কাছে এও মোটে নতুন নয়। দক্ষিণাবাবু খবর দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। ললিতা আবার কার্পেটের দিকে মনোনিবেশ করলো। খুলে দিলো রেডিয়ো সেট্‌টা—বাতাসে বইলো সুরের স্রোত।

কার্পেটের উপর ফুল তুলে কিন্তু সময় কাটানোই চলে শুধু, সময়কে অনুভব করা যায় না কোন রকমে। মধ্যে মধ্যে হাতের সূচ যায় থেমে, উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতে হয় বাগানের দিকে—যেখানে ঝাউ গাছ-গুলি মর্ম্মরিত হচ্চে মাঘের বাতাসে, হেনা-মঞ্জরীর গন্ধ উদাস করে তুলচে চারি পাশ! ভারি ভাল লাগে তার হেনার মঞ্জরীগুলি, কোথায় যেন ললিতার সঙ্গে সদৃশ্য আছে তাদের। ভারি মিষ্টি ফুল, মিষ্টি তার গন্ধ। কাছে দাঁড়িয়ে গন্ধ মেলে না, কিন্তু দূর থেকে যেন নেশা ঘনিয়ে আনে ললিতার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে। ললিতা তখন আর সেলাইয়ের কাঁটার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না, দৃষ্টি ভেসে চলে দৃষ্টি-সীমার বাইরে··· বালিগঞ্জের হাল ফ্যাস্যানের বাড়ীগুলি, মাঠ ঘাট পার হয়ে—যেন কোন্ তেপান্তরের দেশে, যেখানে রূপকথার রাজপুত্র চলেচে পক্ষীরাজের পীঠে সওয়ার হয়ে ঘুমন্ত পুরীর উদ্দেশ্যে, সোনার কাঠী দিয়ে নিদ্রিতা রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে···

রূপকথার রাজার ছেলে থাকে কল্পনায়, কিন্তু সেদিন কার্পেট থেকে মুখ তুলে ললিতা হঠাৎ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তার সামনে দাঁড়িয়ে সুকুমার।—একেবারে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু একেবারে বাস্তব। সুকুমারের চুলগুলি এলোমেলো, রুখু, পরণে থান কাপড়, খালি গাযে সাদা একটা আলোয়ান জড়ানো, পায়ে জুতো পর্য্যন্ত নেই। এতদিন পরে, এমন ভাবে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হবে এ কথা কি আমরাই জানতাম? ললিতা আশ্চর্য্য হবে, এ আর এমন কি বেশী!

সুকুমারই কথা বললে।

—এসেছিলাম বিশেষ একটা খবর দেবার জন্যে, কিন্তু ওঁরা দুজনেই বেরিয়েচেন দেখচি। কখন ফিরবেন বলতে পারেন?

ললিতা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো ; কোন রকমে বলতে পারলো—'ওঁদেব ফিরতে একটু রাত হবে বোধ হয়।'

ও! তা হলে······

ললিতা এবার আত্মস্থ হতে পেরেচে, কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য সহজ করে বললে : এতদিন কোথায় ছিলেন ?

সুকুমার বললে, দেশে যাবার দিন কয়েক পরেই মা অসুখে পড়লেন। দেখতে দেখতে সামান্য জ্বর দাঁড়ালো নিউমোনিয়ায়। তারপর যমে মানুষে চললো টানাটানি, কিন্তু দিন ছয়েক আগেই সব শেষ হয়ে গেচে।

কলকাতায় কবে এলেন ?

আজই সকালে। শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কিনতে হবে, তা ছাড়া এখানে কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে যাওয়াও উদেশ্য ছিল। একদিনে কাজ মিটবে না, ভেবেছিলাম, এইখানেই দিন দুই কাটিয়ে, একেবারে জিনিসপত্র খরিদ করে বাড়ী ফিরবো। কিন্তু ওঁরা যখন কেউই বাড়ীতে উপস্থিত নেই, তখন বোধ হয় সন্ধ্যের ট্রেণে ফিরে যাওয়াই ভালো।

ললিতা একটু ভাবলে, তারপর বললে, তাঁরা ন'টার মধ্যেই এসে পড়বেন, আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করুন না কেন? ওঁবা তাতে খুব খুশী হবেন।

সুকুমার বললে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁরা খুশীই হোতেন এটা ঠিক। কিন্তু সব কথা আপনি তো জানেন না।

কেতকীদির সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়েছিলেন বুঝি ?

কতকটা তাই এবং হয়তো তার চেয়ে বেশী।

ললিতা এবার মিষ্টি করে একটু হাসলো, তারপর বললে, ঝগড়া তো আপনাদের প্রায়ই হোতো, তা ছাড়া, সকলেরই হয়।

তা হয়। কিন্তু আমি যদি বলি, শেষ ঝগড়ার মূলে ছিলেন আপনি নিজে, তা হোলেও কি আপনি আমায় থাকতে বলবেন ?

এ কথায় ললিতার আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই—অনেকদিন থেকেই এমনি একটা ব্যাপার সে আভাসে-ইঙ্গিতে অনুমান করে আসচে! ললিতা একটু হাসলো ; তারপর বললে : তাই বুঝি ধূলোপায়ে বিদেয় নিচ্ছিলেন—আমাকে বকুনীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ?

যখন উপকার করবার অধিকার নেই, তখন অপকারই বা করবো কেন বলুন!

অধিকারের কথা ছেড়ে দিন সুকুমারবাবু, কিন্তু অপকারের ভয় করবেন না, কারণ, অনেক রকম অপবাদ সহ্য করা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি যে অবস্থায় আজ এখানে এসে পৌঁছেচেন, তাতে যদি ওঁরা নেই বলে আপনাকে এখুনি বাড়ী ফিরে যেতে হয়, সেইটেই বোধহয় সব চেয়ে বড় অন্যায় হবে। আপনার নিজের কোন আপত্তি না থাকলে—

সুকুমার বিব্রতভাবে বললে, না, না, এতে আমার অপত্তি কি থাকতে পারে বলুন! সমস্ত দিন টোঁ টোঁ করে খালি পায়ে কলকাতা চষে বেড়িয়েচি, এখানে আসবার আগে একটু বিশ্রামের লোভ যে একেবারে ছিল না এ কথা বললে মিথ্যে বলা হয়।

—তা হলে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে এসে বসুন, আমি কম্বলের আসন এনে দিচ্ছি।

—কম্বলের আসন দরকার হবে না, আচার বিচার সম্বন্ধে অতখানি কড়াকড়ি নেই, আপনার অনুমতিই যথেষ্ট।

সুকুমার ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। ললিতা বললে, সমস্ত

দিন ঘুরে বেড়িয়েচেন, মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন না, আমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি···

সুকুমার বললে, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পাট নেই জানেন তো···

ললিতা বললে, জানি। কিন্তু ফল বা মিষ্টিতে কোন দোষ নেই— বাপ মা দুজনকে পর পর খেয়ে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান জন্মেচে। আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি কলঘর থেকে আসুন, আমি কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে আসচি···

সুকুমারকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ললিতার চোখ মুখের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যেতো তার মধ্যে হঠাৎ যেন উৎসাহের বন্যা এসেচে। সুকুমার ললিতাকে এতদিন অত্যন্ত ধীর, স্থির, সংযত মেয়ে বলে জেনে এসেচে। কিন্তু আজ তার কণ্ঠস্বরে, চোখের তারায়, ঘর থেকে চলে যাওয়ার লঘু ও ললিত ভঙ্গিমায়, সুকুমার যেন ললিতাকে নতুন করে দেখতে পেলো। ললিতার এমন অন্তরঙ্গ রূপ এর আগে অন্ততঃ তার চোখে পড়ে নি। প্রথম বসন্তের বাতাসে ললিতার মনের অন্ধকারের পর্দ্দা হঠাৎ উড়ে গেল কেমন করে, সুকুমার বসে বসে তাই ভাবতে লাগলো। এই আকস্মিক অন্তরঙ্গতার অন্য কোন অর্থ নেই তো? সুকুমার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলে। না, না, তখনই মনে মনে স্বীকার করলে, এ শুধু সৌজন্য, সহজ ভদ্রতা, এর অন্য কোন অর্থ নেই। ভারি ভালো মেয়ে এই ললিতা, ভারি মিষ্টি মেয়ে, ভারি ভদ্র।

শ্বেত পাথরের একটি রেকাবীতে কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে ললিতা যখন ফিরে এলো, সুকুমার তখন কলঘর থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসেচে।

মাটীতে কম্বলের আসন বিছিয়ে, হাতের তালুতে জল নিয়ে ললিতা মেঝের খানিকটা জায়গা মুছে ফেলে রাখলো রেকাবীখানা সেইখানে। শ্বেত পাথরের গ্লাস এনে রাখলো পাশে। তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে, আসুন,—

যন্ত্রচালিতের মতো সুকুমার আসন দখল করে বসলো। সামনে এসে দাঁড়ালো ললিতা। কিন্তু সুকুমার যেন খাবার কথা হঠাৎ ভুলে গেল, কি বলে ললিতাকে ধন্যবাদ জানাবে ঠিক করতে পারলো না। সত্যি, তরুণী নারীর এ মূর্ত্তির সঙ্গে তার পরিচয় নেই; তাদের সুকুমার দেখেচে ড্রয়িংরুমের একশো বাতির আলোয়, কিম্বা সিনেমার অতিআধুনিক ছবিতে। হলিউডের আকাশে যেমন সিনেমার তারা, অল্প বয়সের মেয়েরা সুকুমারের কাছে তেমনি রহস্যময় আর সুদূর। এমন সাধারণ পটভূমিকায়, এমন অনায়াস অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ আলোয় তাদের দেখা হয়নি সুকুমারের। ললিতা আজ সেই সুযোগ তাকে দিয়েচে, সুকুমার এর জন্য ললিতার প্রতি কৃতজ্ঞ। আষাঢ়ের নবমেঘের মতো এই সহজ কৃতজ্ঞতা সুকুমারের সমস্ত মন ছেয়ে ফেললো। কিন্তু তার জন্য সুলভ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তার বাধে। এই মুহূর্ত্তগুলিকে সুকুমার মনে মনে উপভোগ করলো, কিন্তু কথা বলতে পারলো না একটিও।

ললিতা বললে, মুখ আর হাতের কোনটাই আপনার চলচে না, কি হোলো বলুন তো? কেতকীদির কথা ভাবচেন বুঝি?

সুকুমার বিব্রত ভাবে বললে, না, না, কি যে ভাবেন আপনি আমায় ··

শেষ পর্য্যন্ত আহারের পালা চুকলো এক সময়। কিন্তু ঘড়িতে তখন

মাত্র সাতটা বাজে। ওদের ফিরতে অন্ততঃ দু ঘণ্টা দেরী। এই দু' ঘণ্টাকাল ললিতার কাছে বসে গল্প করা তার পক্ষে অসম্ভব, নিজের সম্বন্ধে ললিতার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা সুকুমার সৃষ্টি করতে চায় না। তার চেয়ে কোলকাতায় গিয়ে কতকগুলো জিনিসপত্র কিনে কাজ এগিয়ে রাখা ভালো। কিন্তু ললিতার এতখানি সৌজন্যের পর হঠাৎ উঠে যাওয়া হয়তো অন্যায় হবে; হয়তো কেন, নিশ্চয়। কোন কারণে ললিতাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা সুকুমারের নেই। তা ছাড়া, সমস্ত দিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে শরীরের উপর অত্যাচারও বড় অল্প হয়নি। খাওয়া দাওয়ার পর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর যেন অলস হয়ে আসচে। একটু শুতে পারলে মন্দ হোত না। কিন্তু সে কথা তুলতে সুকুমারের লজ্জা হতে লাগলো। এখুনি হয়তো ললিতা নিজেই বিছানা করতে ছুটবে। তা ছাড়া কেতকী এবং দক্ষিণাবাবুর অনুপস্থিতিতে, হঠাৎ এতকাল পরে হাজির হয়ে এতখানি সুবিধা নিতে কোথায় যেন তার বাধতে লাগলো।

ললিতা পাথরের রেকাবী ও গ্লাস বাইরে রেখে এসে বললে, আপনি এইখানেই বসুন সুকুমারবাবু, আমি নিচে থেকে রান্নাঘরটা ঘুরে আসি।

সুকুমার মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সোফায় উঠে বসলো।

রেডিয়োয় কি একটা করুণ সুর বাজচে। সুকুমার বসে বসে শুনতে লাগলো; হয়তো ঠিক শোনা বলে না—কাণে এসে পৌছতে লাগলো কোন রকমে। নানা চিন্তার জাল বুনতে লাগলো সুকুমার। এতদিন পরে হঠাৎ এমনি করে এখানে এসে পৌছানো তার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বলতার পরিচয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেতকী তার দেশের ঠিকানা জানতো, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটা

চিঠি লিখে খোঁজ নেওয়া সে দরকার মনে করেনি। তবু তাকে আসতে হোল, না এসেই বা কি করবে সুকুমার? এই কদিন ধরে কতেকীকে ভোলবার জন্য কি কঠিন চেষ্টাই না সে করলো, কিন্তু ফল হোলো না কিছুই। কেতকীর আচরণের হাজার রকম ত্রুটি বিশ্লেষণ করে নিজেকে সুকুমার কঠিন করবার চেষ্টা করলো, ঠিক করলো কেতকীর কাছ থেকে সানুনয় অনুরোধ না এলে ওর সঙ্গে আর দেখা করবে না কিছুতে। শেষ পর্য্যন্ত সুকুমার পরিচিত হাতের লেখা একখানি চিঠির প্রত্যাশায় লালায়িত হয়ে উঠলো, কিন্তু এক মাসের মধ্যেও কেতকীর তরফ থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। এমন সময় মা অসুখে পড়লেন। ডাক্তার, ওষুধ, ছুটোছুটি—বিশ্রামের অবকাশ রইলো না বললেই হয়; তবু সেই অনবসরের মাঝখানেই একটি মেয়ের অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি, অভিমান উদ্ধত ভঙ্গিমা তাকে বারবার চঞ্চল করে তুলতে লাগলো। এমন কি মায়ের অসুখ যখন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো, তখন এমন কথাও সুকুমারের মনে হয়েছিল যে, কেতকীকে যদি সুকুমাব তার মায়ের অসুখের সংবাদ দিযে চিঠি লেখে তা হলে সে না এসে পারবে না কিছুতেই। মায়ের রোগশয্যার শিয়রে তাদের কলহের ঘটবে অবসান, দুজনে সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে মাকে আবার সুস্থ করে তুলবে। তাদের গ্রামের পথে কদাচ কখনও একখানা মোটর এসে ধুলো-কাদা ছিটিয়ে চলে যায়। কিন্তু মোটরের আওয়াজ পেলেই সুকুমারের মনে হয়েচে, দক্ষিণাবাবুকে নিয়ে কেতকীই বুঝি হাজির হোলো একেবারে তাঁদের গায়ে। যে রকম খেয়ালী আর একগুঁয়ে মেয়ে কেতকী, হঠাৎ এমনি করে এসে পড়াই বা আশ্চর্য্য কি!

সুকুমারের এমনি মানসিক অবস্থার মাঝখানে তার মা হঠাৎ মারা

গেলেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সুকুমারের মা-ই ছিলেন শুধু, সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে সুকুমার দুঃখ পেল বৈকি। কিন্তু সেই দুঃখের দিনে মনে পড়লো আবার সেই একজনকে, মনে হোলো, যে স্নেহের উৎস শুকিয়ে গেল তার জন্য সান্ত্বনা দিতে পারে শুধু সেই একটি মানুষ। ছুটে এল সুকুমার বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত। ঘড়িতে আটটা প্রায় বাজে, এখনও একঘণ্টা এমনি ভাবে কাটাতে হবে তাকে। হাতের কাছে একটা বই কি মাসিক পত্রও নেই যে বসে বসে পড়া যায়। রেডিয়োয বাজার দর বলা সুরু হযেচে; কোনদিন যদি সিনেমায় বাজার দব জানাবার ব্যবস্থা হয তা হলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে ভাবতে ভাবতে সুকুমার মনে মনে হাসতে লাগলো। আমরা নিছক আনন্দ করতে ভুলে যাচ্চি—সুকুমার বসে বসে ভাবতে লাগলো,—আনন্দের সঙ্গে চাই ব্যবসাবুদ্ধির ভেজাল, যে উপন্যাসের পাতায় কুটনো কোটার বিশদ বিবরণ থাকে পাতার পর পাতা জুড়ে বাঙ্গালা দেশে তাব গ্রাহক-সংখ্যা বেশী। ললিতা সেই কতক্ষণ হোলো নিচে গেছে এখনও তার ফিরে আসবার সময় হয় নি। ললিতা কি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হোলো? কে জানে! কি অভিনয় করচে কেতকীদের দল, শকুন্তলা? শকুন্তলা চমৎকার নাটক, কেতকী নিশ্চযই নাম ভূমিকায় অভিনয় করে নি, সম্ভবতঃ প্রিয়ম্বদা সেজেচে—শকুন্তলা হোলেও মানাতো তাকে। 'শকুন্তলা' অভিনয করতে কতক্ষণ সময় লাগে? তিন ঘণ্টা না তারও বেশী? নিউ এম্পায়ার থেকে বালিগঞ্জ, মোটরে আসতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে বই কি। আশ্চর্য্য হয়ে যাবে কেতকী, হঠাৎ এমন মূর্ত্তিতে তাকে এখানে দেখে। বিস্ময়ে সেই গভীর, আয়ত চোখ দুটি বিহ্বল হয়ে উঠবে ক্ষণকালের জন্য, তারপর···ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসবে তার কাছে—

হয়তো বলবে, 'কেমন ছিলে, কোথায় ছিলে এতদিন? হঠাৎ মনে পড়লো যে আমাদের?' কিম্বা হয়তো কিছুই বলবে না, আষাঢ়-আকাশের মতো থমথমে মুখ নিয়ে বসে থাকবে তার পাশে।......

আলস্যে সুকুমারের সমস্ত শরীর মন্থর, শিথিল হয়ে আসচে। হাই তুললো সুকুমার বার কতক। তারপর আলোয়ানটা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ভাল করে টেনে দিয়ে, মাথাটা দিলে সোফার উপর এলিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে উপরে উঠে ললিতা দেখলো, সুকুমার সোফার প্রান্তে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিযে পড়েচে। সুকুমারের নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে কেতকী কতক্ষণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রেডিয়োয় ততক্ষণে ইংরিজী প্রোগ্রাম সুরু হয়েচে. ভায়োলিনের ক্ষীণ, করুণ সুর মুখর করে তুলেচে ঘর। সুকুমারের ঘুম পাছে ভেঙ্গে যায় বলে ললিতা রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে। কিন্তু সুকুমারের ঘুম ভাঙ্গাই বোধ হয় উচিত! মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে ললিতা আবার রেডিয়োর তারটা দিলে সুইচের সঙ্গে জুড়ে। কিন্তু সুকুমারের ঘুম ভাঙলো না, সমস্ত দিনের ছুটো-ছুটির পর সুকুমার একেবারে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেছে। কি করবে এখন ললিতা? ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে? কিন্তু তাতে যদি সুকুমারের অসম্মান হয়? তা ছাড়া, নিচে যেতে তার ইচ্ছা করচে না মোটেই, সুকুমারের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে অনায়াসে সে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে! সত্যি, ঘুমুলে মানুষকে কত নিকট, কত অসহায় মনে হয়! সুকুমার শুধু একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে এসেচে, জামা পর্য্যন্ত নেই একটা, শীত করচে নিশ্চয়ই—ললিতা তার বিছানা থেকে র‍্যাগখানা নিয়ে সুকুমারের গায়ে ভাল করে ঢেকে দিলো। সুকুমার র‍্যাগখানার কোমল ও উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে শুলো।

আর ললিতা ?

দূরাবগাহ দৃষ্টি নিয়ে ললিতা চেয়ে রইলো জানালার বাইরে। মাঘ মাসের জ্যোৎস্না রাত। অল্প অল্প কুয়াসার মধ্যে বিস্তীর্ণ, নীল আকাশ যেন ঘুমে ঢুলচে। হঠাৎ এক ঝলক বাতাসে বাগানের প্রান্ত থেকে ভেসে এলো নাম-না-জানা কোন্ ফুলের সুগন্ধ। পাখীর করুণ কান্না বুঝি ভেসে গেলো জ্যোৎস্নার দেশে। ললিতা ফিরে তাকালো সুকুমারের দিকে। ইচ্ছে হোলো, সুকুমারের রুখু চুলগুলির উপর ভয়ে ভয়ে আঙুলের স্পর্শ দেয়,...এগিয়ে এলো খানিক, কিন্তু...

দ্বারের বাইরে পদশব্দ শোনা গেল সেই মুহূর্তে !

কেতকী !

ললিতা কাঠের মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হয়ে গেলো, মনে হোলো, বাইরের আকাশে চাঁদ হঠাৎ মেঘের রাজ্যে ডুবে গেছে...মাথার সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলো যেন ঝন্‌ঝন করে বেজে উঠেছিল তারস্বরে...ললিতা কোন মতে খাটের প্রান্তে হেলান দিয়ে আত্মরক্ষা করলে !

কেতকীর চোখের দিকে চেয়ে ললিতার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো —মুহূর্ত্তে ব্যাখ্যা হয়ে গেলো তার প্রতি কেতকীর অদ্ভুত যত আচরণের ! অন্ধকার রাত্রে ললিতা একবার ঘোর কালো রঙের বেড়ালের চোখ জ্বলতে দেখেছিলো ; কেতকীর চোখের দিকে চেয়ে ললিতার আজ হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে গেল।

তবু ললিতা প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললে : সুকুমারবাবু আপনার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েচেন কেতকী-দি।

কেতকীর তিক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল : সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি

...কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের প্রেমের স্বপ্নে উৎপাত ঘটালাম বোধ হয়!

হঠাৎ যেন বাজ পড়লো ঘরের মধ্যে—ললিতা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এদিকে কেতকীর উত্তেজিত, তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজে স্নকুমার ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসলো সোফার উপর! চোখ চেয়ে প্রথম কিছুই যেন উপলব্ধি করতে পারলে না। তারপর মনে পড়লো,...হ্যাঁ, মনে পড়লো, এখানে এসে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর আর কিছুই তার মনে নেই। ইতিমধ্যে কেতকী এসে পৌছেচে বাড়ীতে, কতক্ষণ এল কেতকী?

স্নকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললে, এই যে তুমি এসে পড়েচো!

অস্নবিধে হযতো বলো, আরও খানিকটা ঘুরে আসি। ক্লান্তি দূর করবার জন্যে আরও খানিকটা বিশ্রাম হয়তো তোমার দরকার!

স্নকুমার প্রথমটা কেতকীর কথাগুলোর মানে ঠিক বুঝতে পারে নি, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেটা সে উপলব্ধি করতে পারলো সে মুহূর্ত্তে তার মনে হোলো, ঘরের নিচে মাটী কাঁপচে, তার সমস্ত শরীর কাঁপচে...চোখ মুখ তার লাল হযে উঠলো। কাণ দুটো পর্য্যন্ত গরম হযে উঠেচে, স্নকুমাব বেশ বুঝতে পারচে। কিন্তু কি বলবে স্নকুমার? এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসরে যাকে সে অসম্ভব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দিয়ে মনে মনে অপরূপ করে গড়ে তুলেছিল, সে তো এক মুহূর্ত্তে খেলো, সাধারণ, ইতর হযে গেলো! তার কুৎসিত ইঙ্গিতের জবাব দিতে হবে মনে করে স্নকুমারের সমস্ত শরীর যেন সঙ্কুচিত হযে উঠলো। স্নকুমার মুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারলো যে এতদিনে শেষ মুহূর্ত্ত সত্যি ঘনিয়ে এসেচে। এত সংশয়, এত উৎকণ্ঠা...এতদিনে তার সমাপ্তি!

সুকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কেতকীর সামনে; তারপর সুস্পষ্ট এবং আবেগশূন্য কণ্ঠে বলতে লাগলো—আমি প্রেম করতে আসিনি কেতকী, এসেছিলাম মায়ের মৃত্যুর পর একটু সান্ত্বনা পাবার লোভে। তার ষোলোআনাই আজকে পেলাম! তার জন্যে দুঃখ করবো না। তবু যাবার সময় এটুকু বলে যাওয়া দরকার যে মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখো। তাতে লাভের মাত্রা না বাড়ুক, লোকসান হবে না খুব বেশী!

কেতকী উদ্ধত, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললে, এ উপদেশ শুনে চলবার বয়স আজ আর নেই সুকুমার, চোখ চেয়ে দেখাটাকে আমি দোষ মনে করি নে।

না, আমিও বলি নে। কিন্তু সেই সঙ্গে কল্পনার মাত্রাটাকে একটু খাটো করো। চোখে যখন কিছুই দেখো নি, তখনও সন্দেহের বিষে তুমি দিন রাত জ্বলে পুড়ে মরেচ। টাকার চূড়োয় বসে পৃথিবীকে খুব ভাল করে দেখা যায় কি না জানিনে কিন্তু তোমার মনই তোমায় সকলের কাছে ছোট করে রেখেচে। যদি পারো তাকে একটু সুস্থ করবার চেষ্টা করো।

সুকুমার ঘর থেকে চলে যেতে উদ্যত হোলো। কেতকী একটিও কথা বললে না, কিন্তু ললিতা মনে মনে প্রমাদ গণতে লাগলো। সুকুমারের এমনি করে চলে যাওযার পর, এ বাড়ীতে তার একমুহূর্ত্ত স্থান নেই, সে তো ললিতা স্পষ্টই বুঝতে পারচে। অথচ, কত বড় অবাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুকুমার আর কেতকীর এই বিচ্ছেদের সূচনা হোলো সে কথা ভেবে ললিতার দুই চোখ বেদনায়, অপমানে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এলো। সুকুমারের কাছে এগিয়ে গিয়ে ললিতা বললে, আপনি যাবেন না সুকুমারবাবু, তাতে এই মিথ্যেকেই স্বীকার করে নেওয়া হবে। কেতকী-দিকে একটু ভাববার অবসর দিন, এখুনি তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন···

ললিতার কথা তখনও শেষ হয় নি, কেতকীর তীব্র, তীক্ষ্ণ, কাংস্য-কণ্ঠ যেন টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের মধ্যে ভেঙ্গে পড়লো : আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না ললিতা, তোমার সুপারিশ নিয়ে যদি কারও ভাঙা মন জোড়া দিতে হয়, তার চেয়ে চিরকালের মতোই তা ভাঙ্গা ভালো।

সুকুমার বললে, তুমি রাগ করো না কেতকী, কিন্তু এ কথা সত্যি, যে-মন ভাঙলো, তাকে মেরামত করে কাজ চালাবার চেষ্টা না করাই ভালো। দক্ষিণাবাবুকে জানিয়ো যে আজকের এই ঘটনাব পর, তাঁকে আত্মীয় হিসেবে কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন এবং তোমাকেও। ভুল বুঝতে পারলে হয় তো তুমি একটু দুঃখিত হবে, কিন্তু নিঃসংশয়ে নিজের কাছে কোনোদিন স্বীকার করতে পারবে না যে আজকের দিনে এত বড় সুযোগ পেয়েও কোন অন্যায় আমরা করি নি। তার চেয়ে তোমার-আমার আলাপে ছেদ পড়াই আজ দরকার। তাতে অন্ততঃ সন্দেহের বোঝা থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে।

কেতকীর ঠোঁট কাঁপলো, কিন্তু কিছুই বললে না। ললিতা জানালার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়ালো। কি বলবার থাকতে পারে তার এবং সুকুমারই বা তাকে বলবে কি ?

সুকুমাব আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে বললে : আমি নিচের লোক, হঠাৎ অনেকখানি উপবে উঠে এসেছিলাম ; তাতে নিজেও যতখানি অস্বস্তি বোধ করেচি, তোমাদেবও অসুবিধা ঘটিয়েচি বিস্তর। আজ থেকে অন্ততঃ সহজ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো, কোথায় কোন্ কথা সুষ্ঠু ভাবে প্রযোগ করতে হবে তা ভেবে আর ঘেমে উঠতে হবে না।... আচ্ছা, নমস্কার কেতকী, আমি চললাম।

কেতকী এখনও কোন কথা বললে না।

সুকুমারের বিদায় আসন্ন উপলব্ধি করে ললিতা হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। সুকুমার বললে, দু ঘণ্টার জন্যে এসে আপনাকেও বড় কম কষ্ট দিলাম না, অপরাধ নেবেন না।—আর যদি কোন দিন, প্রয়োজন মনে করেন, খবর দেবেন।

ললিতা নির্নিমেষ নেত্রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো, তারপর বললে : একটি কাজের ভার আপনাকে আজই নিতে হবে। কাল একবার লীলা-দির হোষ্টেলে খবর দেবেন।

'আচ্ছা, নমস্কার'—আলোয়ানখানা গায়ে জড়িয়ে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ললিতা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে অন্তর্ধান করলে। আর কেতকী, এইমাত্র সে নাটক অভিনয় করে ফিরেচে, চোখ-মুখের রঙ তখনও ভালো করে মুছে ফেলা হয় নি, এখানে-সেখানে পেণ্ট্ উঠেচে ফুটে! সুকুমার চলে যাওয়ার পর কেতকী কতক্ষণ যে সেই ঘরের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে রইলো তার কোন হিসেব নেই। তার পর দেখা গেলো, তার পাউডার-ক্রীম আর পেণ্ট্-রঞ্জিত চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা এসেচে নেমে! কিন্তু কঠিন মেয়ে কেতকী, এত সহজে ভেঙ্গে পড়া তার অভ্যাস নয়। তখুনি সে ছুটলো বাথরুমের দিকে এবং তার পর যখন সে বেরিয়ে এলো মুখ-হাত ধুয়ে, তখন কে বলবে, কেতকী—এই সহরের অত্যন্ত আধুনিক, অত্যন্ত অভিমানী এবং অত্যন্ত গর্ব্বিত মেয়ে কেতকী, এই কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ঠিক ছেলে-মানুষের মতো?

পা পর্য্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে লীলা ল্যাস্কির একখানা বই পড়বার চেষ্টা করছিলো, এমন সময় ভিজিটার্স রুমে তার ডাক পড়লো। হঠাৎ

সুধাংশুই এসে হাজির হোলো কি না ভাবতে ভাবতে লীলা যখন নিচে এসে পৌছলো, তখনও সে ভাবতে পারে নি যে সুকুমার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে। ঘরে ঢুকে ওর বিস্ময়ের আর অন্ত রইলো না। নমস্কার জানিয়েই জিজ্ঞাসা করলে : হঠাৎ আমার খোঁজে এসে পড়লেন যে সুকুমারবাবু ?

সুকুমারের চোখ-মুখ ভোরবেলার আকাশের মত বিবর্ণ, ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে সারারাত্রি ধরে সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেচে। তবু হাসবার চেষ্টা করে সুকুমার বললে, একটু আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। কখনও কখনও এমনি অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটে। কতকগুলো কথা আপনাকে বলবার জন্যে এসেচি।

লীলা সুকুমারের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তার পর আগের দিন সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা খুলে বললো লীলার কাছে। লীলা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তার পর বললে, এমনি একটা ব্যাপার ঘটবে অনেক দিন থেকেই আশা করছিলাম। কিন্তু আপনি হঠাৎ কেতকীর অপমান করলেন কেন ?

সুকুমার বললে, এতদিন নিজের অপমান করে আসছিলাম, কিন্তু আর পারা গেল না। কিন্তু আমার কথা বাদ দিন। ললিতাকে যত শিগগির বালিগঞ্জ থেকে সরিয়ে আনতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার ; বলেন তো আমি জয়ন্তদাকে চিঠি লিখি, নয় তো আপনিই—

লীলা বললে, চিঠি আমিই লিখবো। কিন্তু আপনি তো মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য দেশে চললেন, ফিরচেন কবে ?

সুকুমার বললে, আপাততঃ কিছুকাল গ্রামে অজ্ঞাতবাস। দশ বছর ধরে এই সহর আমার অস্থিতে মজ্জায় মিশে গেছে, নানা রকমে

উপভোগ কবলাম অদ্ভুত এই সহুরে জীবনকে। এবাব তাকে ভোলবাব সাধনা।

লীলা বললে, ভোলা কি এত সহজ সুকুমাববাবু ?

সুকুমাব বললে, ভয় তো সেইখানে। মনে আছে, ছোট বেলায ভাবতাম, আমাব বাড়ীর সামনে যে দীঘি ছিল, একটি ছোট ডিঙ্গী তৈবী কবে তাতেই চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবো—নৌকোর মধ্যে থাকবে ছোট্ট একটি ঘব। দীঘিব দুই পাশে বড বড নিম আব সজনে গাছ, জলেব বুকে বাশি বাশি পদ্ম। এক গলা ঘাসে মুখ ডুবিযে ঘাস চিবোবে গরুগুলো, বাত্রে অন্ধকাবকে স্পন্দিত কবে উঠবে ঝিঁঝিব অশ্রান্ত কনসার্ট, আকাশ, মাটি, জল, সব একাকাব হযে যাবে। তাবপব লেখাপড়া শেখবাব জন্যে এলাম এই কলকাতাব। কোথায বইলো গ্রাম, কোথায গেল সেই দীঘি। জীবনেব গতি হোলো উন্মত্ত, বক্তে এলো নূতন উত্তেজনা, মনে মনে বাসা বাঁধলাম চৌবঙ্গীব আধুনিকতম ফ্ল্যাটে। মেঠো বাশীব বদলে ব্যাঞ্জোব গুঞ্জন ঝঙ্কাব শোনবাব জন্যে লালাযিত হযে উঠলাম। আজ আবাব বিপবীত দিকে যাত্রা। দেখা যাক, ঠিক সেই জাযগাটিতে ফিবে যাওয়া যায কি না।

লীলা বললে, সত্যি তা যায না সুকুমাববাবু, তা হোলে এ যুগেব কোন মানে থাকতো না।

'বোধ হয তাই, কিন্তু সহবকেও আব ভাল লাগবাব উপায নেই।' —একটু চুপ কবে থেকে সুকুমাব বললে। 'কাল সমস্ত বাত ধবে নিজেকে নিযে ভেবেচি। আব ভেবেচি ললিতাব সম্বন্ধে। আমাব সামান্য একটু অপবাধে তাঁব সমস্ত ভবিষ্যতেব চেহাবা বদলে যেতে বসেচে! কি কবে এব ক্ষতিপূবণ হয তাও ভাবতে পাবলাম না। একবাব মনে হোলো,

ললিতাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব জানিয়ে জয়ন্তদার কাছে চিঠি লিখি— কিন্তু তাও শেষ পর্য্যন্ত পারলাম না। ধরুন, সত্যি যদি এই বিষয়ে জয়ন্তদাকে আমি চিঠি লিখি, তা হোলে কি তিনি রাগ করবেন ?

লীলা বললে : না, রাগ দাদা করবেন না। কিন্তু ললিতা হয় তো মত দেবে না।

'কেন বলুন তো ?'

'অন্ততঃ আমি দিতাম না এবং ললিতা যাতে এ-প্রস্তাবে রাজী না হয় তার চেষ্টাও হয় তো করবো।'

'কেন ? কেন ?'

'আপনি কেতকীর উপর প্রতিশোধ নিতে চাইচেন।'

'প্রতিশোধ !'

'ভেবে দেখবেন অন্ততঃ। নইলে ললিতাকে বিয়ে করা চলে, এ কথা এর আগে আপনার কোন দিন মনে হয় নি কেন ? তা ছাড়া—

'তা ছাড়া ?—বলুন, বলুন—'

'আপনি কেতকাকে কত বেশী ভালবাসেন, সে কথা ললিতা খুব বেশী রকম জানে। কেতকীকে ভোলবার ওষুধ হিসেবে ললিতাকে বিয়ে করতে চান আপনি। এতে দু জনের কেউ সুখী হতে পারবেন না।'

সুকুমার কতক্ষণ চুপ করে রইলো, তার পর বললে : হয় তো আপনিই ঠিক বলেচেন। কিছু বুঝে উঠতে পারচি না।…সম্ভবতঃ আপনার কথাই সত্যি। আচ্ছা, জয়ন্তদাকে চিঠি লিখবেন যত শীঘ্র পারেন। আমি উঠলাম,—'

সুকুমার আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করলো না। লীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে আবৃত্তি করলো

একটা ইংরিজী কবিতা—'This is the dead land, this is the Cactus land...' তার পর চটির শব্দে সিঁড়ি মুখরিত করে উঠে এলো উপরে, নিজের ঘরে। বসলো গিয়ে টেবলের সামনে; ড্রয়ার টেনে বা'র করলো চিঠির প্যাড। মনে মনে আবার দু লাইন কবিতা আবৃত্তি করলে—

আমাদের মনে এই মহামারী, দেবতার অভিশাপ !
'ফাইল' থাকে না সরকারী দপ্তরে !
তবু এ মৃত্যু জীবনের সাথে আছে ঠিক পাছে পাছে,
গাঁঠছড়া বাঁধা অজানা কি মন্তরে !'

মাঘ শেষ হয়ে এলো, কিন্তু লাহোরের শীত এখনও কমেনি। দুপুরটা বেশ গরম, কিন্তু রাত্রি তেমনি ঠাণ্ডা আর কনকনে। বাঙ্গলা দেশে এখন বসন্ত এসেচে, কিন্তু জয়ন্ত এখনও তার আভাস পায় নি। সকাল থেকে উঠে জয়ন্ত যত অকাজের বোঝা বয়ে বেড়ায়, কলেজের দুটো ঘণ্টা হয় তো সপ্তাহে দু' দিন কামাই করে ফেলে, কোন দিন স্নানাহার না সেরেই কলেজে গিয়ে পৌছয়। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ জানেন জয়ন্তকে, জয়ন্ত দি গ্রেট ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কি ভীষণ 'পপুলার', তাই এ সব সুবিধা তাকে না দিলে চলে না। তা ছাড়া যে ভীষণ জেদী লোক, কিছু বলতে গেলে এক কথায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাওযাও তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়! কি করে জযন্ত সমস্ত দিন, সমস্ত রাত? তার চারি দিকে কাজ আর কাজের বোঝা। রাষ্ট্রীয কোন দলের লেবেল নেই জয়ন্তর, ওদের সঙ্গে তার মতের মিল নেই, তবু কোন

রাজনীতিক সভায় তার অনুপস্থিত থাকবার উপায় নেই, ছেলেরা ধরে নিয়ে যাবেই। এখানকার সেরা রাজনীতিক দলের যারা কর্ত্তা তারাই কি ওকে ভয় করেন কম! জয়ন্ত সহজ কথা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে রহস্যময় করে তুলতে পারে না, তার মতগুলো ছুরির ফলার মত সুস্পষ্ট আর ধারালো। তার রাষ্ট্রীয় চিন্তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার গোঁজামিল নেই। মস্ত বড় একজন নেতা, যিনি পথ দিয়ে গেলে পথের দু'পাশে ভিড় জমে যায়, জয়ন্ত একদিন তাঁকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করেছিলো: এ দেশের চাষীরা কেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না বলুন তো?

তিনি বলেছিলেন—'তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় না বলে। যেদিন তারা চাইবে, সেদিন তাদের কোন অভাবই আর থাকবে না।'

জয়ন্ত বলেছিল, আকাশের চাঁদও তো চাওয়া যায়, কিন্তু তাও কি মেলে?

তিনি বললেন, 'জরুর।'

কিন্তু মেলবার উপায় কি তা তিনি সুকৌশলে বলতে বিস্মৃত হলেন। এদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ যাঁরা চাষী আর মজুরদের বন্ধু বলে পরিচিত, এমনি ভাসা ভাসা ধারণা তাঁদের চাষী-মজুররের সম্বন্ধে। সুযোগ পেলেই জয়ন্ত সে কথা তাঁদের বুঝিয়ে দেয় এবং সেইজন্যই এ দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের সদরে ওর খাতির নেই। তার জন্যে জয়ন্ত মোটেই দুঃখিত নয়। দশ বারোটি ছেলে আছে জয়ন্তর নিজের হাতে তৈরী করা, তাদের নিয়ে জয়ন্ত গ্রামে গ্রামে হৈ চৈ করে বেড়ায়। চাষী মজুরদের এক জায়গায় জড়ো করে হয়তো ঘণ্টা দুই ধরে গল্প করলে তাদের সঙ্গে। বক্তৃতা নয়, গল্প। বাকপটুতার পরিচয় নয়, সহজ অন্তরঙ্গতা। ছোট খাট

কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়েই তাদের এমন নিবিড় করে জয়ন্ত পায় যে ওদের কোন সভায় গিয়ে কোন বিশিষ্ট নেতার দীর্ঘ খেদোক্তি শোনবার ইচ্ছে হয় না মোটে। সত্যি, এ দেশের চাষীরা বছরে কমাস নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যে ফসল মেলে এবং সেগুলি বিক্রী করে যে টাকা আসে, তার অর্দ্ধেকের ওপর কেমন করে মহাজনের খাতায় গিয়ে জমা হয়, উত্তরাধিকার আইনের কৃপায় এবং বংশবৃদ্ধির আশীর্ব্বাদে বিশ বছরের মধ্যে দশ বিঘে জমি কেমন করে সাত ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এসব খবর জয়ন্ত অন্ততঃ তাঁদের চেয়ে ভালো করে জানে। সুদখোর মহাজনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে চাষীদের কেমন করে খরচ কমাতে হবে, চাষের জমিতে নানারকম ফসল রোপণ করে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করতে হবে কেমন করে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কিনে কেমন করে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, এই সব কথা ও সহজ করে, চাষীদের মত করে, চাষীদের ভাষায় তাদের বুঝিয়ে বেড়ায়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে জনসভায় বক্তৃতা করে যাঁরা নাম কিনেচেন, জয়ন্ত তাঁদের কাছে পায় অশ্রদ্ধা আর ভয়, আর যারা চাষীদের দুঃখে ব্যাঙ্ক গড়ে তুলে সুদে টাকা খাটাবার নূতন পথ খুঁজে বেড়াচ্চে তারা ওঠে রেগে। জয়ন্তর কিন্তু এমনি করেই দিনগুলো বেশ কেটে যায়, কাজের ভিড়ে জয়ন্ত নিজেকে ডুবিয়ে রাখে এমনি করে।

তবু, এত কাজের মধ্যে এক জায়গায় জয়ন্ত একেবারে নিঃসঙ্গ। তার বাইরের যে পরিচয়, তার সঙ্গে তার এই নিভৃত-জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক এক দিন রাত্রে মেসে ফিরে জয়ন্তর চোখে ঘুম যখন আসতে চায় না সহজে আর 'ইকনমিক প্ল্যানিং' সংক্রান্ত বইয়ের পাতায় মন বসে না কিছুতেই, জয়ন্তর মন তখন ঘুরে বেড়ায় অনেকদিন আগের

কতকগুলি হারানো সন্ধ্যা, মধুর ও অলস মধ্যাহ্ন আর স্বপ্ন-সুরভিত রাত্রির আশে পাশে।

জয়ন্ত তখনও ছেলে মানুষ, ছেলে মানুষই বলতে হবে, কারণ বয়স তখন বাইশ তেইশের বেশী নয়। সেই সময়ের সামান্য কয়েক দিনের একটি পরিচয় আজও তার মনে কেমন করে স্মৃতি হয়ে রইলো, ভাবতে জয়ন্ত নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

সেদিনের ইতিহাসকে আমরা এমনি ভাবে সাজিয়ে অনায়াসে একটি গল্পের রূপ দিতে পারি—

ড্রাইভারের সীটের পিছনে পা তুলে দিয়ে জয়ন্ত বললে, কোথায় যাবে বলো, ভ্যারাইটিজ না পিকচার হাউসে?

রেবা জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে বললে, তোমার ইচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, বাড়ীতে কেউ রাগ করবেন না তো?

রেবা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল; রাগ করবে কে! থাকবার মধ্যে তো শুধু পিসিমা, রাতে আফিমের ঝোঁকে তিনি এমনি গাঢ় নিদ্রা দেন যে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটে গেলেও তাঁর ঘুম ভাঙ্গে না। চাকরটীকে ডেকে দরজা খুলিয়ে ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত। চলো না যেখানে তোমার খুসী।

জয়ন্ত ড্রাইভারকে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের দিকে ফিরবার হুকুম দিলে। খানিক পরেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো 'ভ্যারাইটিজ'-এর সামনে। কি ছবি আছে তা দেখা দরকার করে না, কারণ ছবি দেখাটাই আজ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। টিকিট করে দুজনে ভিতরে গেল। টর্চ্চের আলো

ফেলে দ্বারী পথ দেখিয়ে দিলে। তখনও ছবি সুরু হতে কয়েক মিনিট দেরী। চারিদিকে বর্ণের উজ্জ্বল্য, এসেন্সের সুরভি, সিগারেটের চমৎকার উগ্রগন্ধ, য়ুরোপীয়ান নরনারীর ভিড়, তাদের কেউ সামনের খালি সীটে পা ঠুকে সিস্ দিচ্চে, কেউ আশপাশের লোকগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খেলো গান সুরু করে দিয়েচে। এরি মধ্যে দুজনে পাশাপাশি দুটি সীট দখল করলো। অডিটোরিয়াম অন্ধকার, সুতরাং সীট দখল কববার পরেই রেবা জয়ন্তর হাতে মৃদু স্পর্শ দিলো। দুজনে এমন ভাবে বসলো যে এর মাথার চুল যেন ওর দেহকে অত্যন্ত সহজে স্পর্শ করে। স্পন্দমান অন্ধকারে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠলো অলক্ষ্য একটি ভাববন্ধন।

কতক্ষণ পরে রেবা বললে, প্রদর্শনী তো আজই বন্ধ হয়ে গেল, তারপর ?

জয়ন্ত হেসে বললে, কিন্তু কলকাতার সিনেমাগুলি হঠাৎ বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই—দারুণ ট্রেড ডিপ্রেসন সত্ত্বেও না।

—কিন্তু ঘন ঘন বাড়ী থেকে আসবার কৈফিয়ৎও দরকার।

—এ রকম অবস্থায় মানুষের ভাববার ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেড়ে যায়, উপায় দু'জনে নিশ্চয় ভেবে ঠিক করতে পারবো। এবার খানিক ছবি দেখা যাক।

রেবার কিন্তু ছবি দেখার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ছোট্ট মেয়ের মতো একরাশ চুল সমেত মাথা দুলিয়ে রেবা বল্লে, থাক ছবি। কাল থেকে কি হবে তাই বলো। শীলাদির বাড়ী ফোন আছে, সেখান থেকে রোজ তোমায় ফোন করবো।

—স্বচ্ছন্দে। আমি রোজ অপেক্ষা করে থাকবো।

—কতক্ষণ ?

—তুমিই বলো।

—রোজ সকাল নটা থেকে সাড়ে নটা পর্য্যন্ত। এর মধ্যে নিশ্চয়…

—কিন্তু তোমার শীলাদি প্রতিমাসে তিন টাকার উপর লোকসান করতে রাজী হবেন তো?

—না হয়, মূল্য ধরে দোবো। কিন্তু চিরকাল ফোন্‌ করেই কাটবে না কি? পরীক্ষা চুকে গেলেই পিসিমাকে বলবো শীলাদির সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চি শিলং। পিসিমা তাতে কখনও আপত্তি করবেন না এবং শীলাদিও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মেয়ে। কাল তা হোলে ন'টা ত্রিশ পর্য্যন্ত?

—দ্যাট্'স নাইস।

রেবা জয়ন্তর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের কোলের মসৃণ শাড়ীর উপর রাখলো। জয়ন্তর আঙ্গুলগুলি তার মুঠির মধ্যে। ছবির পর্দ্দায় একটি মেয়ে তার প্রেমিককে বাহু বেষ্টনে বন্দী করে অধরের স্পর্শ দিচ্চে। সে দৃশ্য এমনি সংক্রামক যে চেয়ারের সামনে যে ইংরাজ ছেলে মেয়ে দুটি পাশাপাশি বশেছিলো, তারাও তাদের অনুসরণ করলে। অন্ধকারের মধ্যেও সে দৃশ্য রেবা আর জয়ন্তর চোখ এড়ালো না। রেবার সিল্কের শাড়ীতে হঠাৎ যেন আগুণ লেগে গেল, জয়ন্তর হাতখানি সে মুঠির মধ্যে প্রাণপণে চেপে ধরলো, অন্ধকারের মধ্যেই তার মুখখানি কখন জয়ন্তর দিকে এগিয়ে এসেচে। তার চুলের সুরভি জয়ন্ত স্পষ্ট অনুভব করতে পারচে।

হঠাৎ আলোগুলি জ্বলে উঠলো। ইণ্টারভ্যাল। রেবা সোজা হয়ে উঠে বসলো আর জয়ন্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে অকারণে ঘন ঘন ঘাড় মুছতে লাগলো।

জয়ন্ত আর রেবার পরিচয়-পর্ব্বের গোড়ার কথাটা কিন্তু আপনাদের বলা হয়নি, এই অবসরে সেটুকু আপনাদের শুনিয়ে রাখি।

জয়ন্ত তখন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। জয়ন্তর বাপ বিলেত গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টার হবার জন্য, কিন্তু হাইকোর্টে তাঁর আবির্ভাব ঘটতো কদাচিৎ। তাঁর ঘরের যে টেব্‌লে মোটা মোটা আইনের কেতাব সাজানো থাকতো, সে টেবলে বসে তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করতেন। এই সাহিত্যচর্চ্চা মানে বাংলা দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি কেনা এবং পড়া এবং বছরে দু'তিনটি করে গল্প-প্রবন্ধ লেখা। লেখার জন্য পারিশ্রমিক দাবী করবার প্রয়োজন ছিল না, পারিশ্রমিকের খাতিরে লেখা নয় বলে যা তা লেখবার প্রয়োজন ছিলনা, সুতরাং লেখার তাঁর demand ছিল। সে দাবী পূর্ণ করবার ইচ্ছা ষোলো আনা থাকলেও উৎসাহ তাঁর ছিলনা, কতগুলি দামী সিগারেট, চুরুট আর ক' পেগ্‌ হুইস্কী শেষ হোলে তিনি একটি গল্প লিখতে পারতেন, মাসিকের সম্পাদকরা সে সংবাদ রাখতেন না। হুইস্কী-সেবা ছাড়াও জীবনে তিনি আর একটি নিষিদ্ধ কাজ করতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে একরকম নিঃসম্বল হ'তে হোলো এই জন্যই। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুদের নিয়ে মোটা টাকার বাজী রেখে ব্রীজ খেলতে বসতেন; বলা বাহুল্য, বেয়ারার হাতে হুইস্কীর 'পেগ'গুলো এই সময় একটু ঘন ঘন ঘোরাফেরা করতো এবং হুইস্কীর রঙ-ধরা মন নিয়ে ক্রমাগত বিডিংএ ভুল করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি প্রতিপক্ষকে মোটা টাকার একটা চেক লিখে দিতেন। এমনি করে সকলের অগোচরে কলসির জল যখন ফুরিয়ে আসতে লাগলো, সে খপর কেউ রাখলোনা। জয়ন্তর মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, সুতরাং ব্রজকিশোরবাবুর সাহিত্য, সুরা এবং তাসের চর্চ্চা সমানভাবেই চলতে লাগলো।

এ হেন বাপের ছেলে জয়ন্ত কিন্তু না গেল বিলেত, না শিখলো নিষ্ক্রিয় আলস্যের মাধুর্য্য উপভোগ। উপন্যাস-সুলভ নায়কদের মতো প্রতিবার

পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার না করলেও মাত্র বাইশ বছর বয়সে সে এম-এ পাশ করলো। ব্রজকিশোর বললেন—যা বিলেত যা, চোখের দৃষ্টি ও মনের প্রসার বাড়বে।

জয়ন্তর বিলেত যাবার পয়সা তখনও ব্রজকিশোরবাবুর ব্যাঙ্কে সঞ্চিত ছিল কিনা তা কারও জানবার সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু দিনকয়েক পরেই বোঝা গেল যে জয়ন্ত ঠিক বিলেত যাবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন ব্রজকিশোরবাবুর বৈঠকখানায় টেলিফোন ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠলো। লালবাজার থেকে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার জানালেন, ব্রজকিশোরবাবুর ছেলে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করবার অভিযোগে ধরা পড়েচে। ছেলে অবশ্য জামিনে খালাস পেতে চায়না, কিন্তু কমিশনার ব্রজকিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—অনেকদিন এ বাড়ীতে এসে তাস আর সিকিয়ের হুইস্কীর সদ্‌ব্যবহার করে গেছেন, ব্রজকিশোর ইচ্ছে করলে জামিনে তাকে···

'না, দরকার হবেনা' বলে ব্রজকিশোর রিসিভার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন জয়ন্তর মামলা যখন এজলাসে উঠলো তখনও তিনি আদালতে গেলেননা, গেল তাঁরই এক কর্ম্মচারী এবং সে যতক্ষণ ফিরে না এলো ততক্ষণ তিনি বাইরে বসে প্রায় এক বোতল দামী মদ শেষ করে ফেললেন। খবর পাওয়া গেল বিচারে জয়ন্তর জেল হয়েচে, ছ'মাস সশ্রম। এ খবর পেয়েও তিনি কোন রকম মন্তব্য করেননি এবং ছ মাসের মধ্যে একদিনও দেখা করতে যাননি ছেলের সঙ্গে। এই কমাস ধরে ব্রজকিশোর দিবারাত্র ম্যানিং ফষ্টর প্রভৃতির ব্রীজের কেতাবগুলো কিনে, লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে সেগুলির পাতায় পাতায় দাগ দিতেন এবং সন্ধ্যার পর বই অনুসারে খেলেও যখন জিততে পারতেন না,তখন তাদের যুক্তির validity

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে ষ্টেটসম্যানে একটা 'কোয়েরী' পাঠাবেন স্থির করে ফেলতেন। সে বছর গল্প আর প্রবন্ধই লিখলেন তিনি দশটির বেশী।

ছমাস পরে জয়ন্ত যেদিন বাড়ী ফিরলো সেদিন ব্রজকিশোর খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে শুধু বলেছিলেন: মা নেই বলে যা করলে তাই সেজে গেল, তিনি থাকলে তোমায় বাড়ী ঢুকতে দিতেন না।

জয়ন্তর মা বেঁচে থাকলে সত্যিই তাকে বাড়ী ঢুকতে দিতেন কিনা কিম্বা এ শুধু ব্রজকিশোরবাবুর অবরুদ্ধ পুত্রস্নেহের অতিসংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ছমাস জেলে কাটিয়ে আসবার পর জয়ন্তর কর্ম্মের পরিধি যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কোথায় কোন্ যুব-সমিতির বার্ষিক উৎসব, জয়ন্তর নামে চিঠি এসে হাজির। কোনো সভায় গেলেই পাঁচজনে মিলে তাকে দাঁড় করিয়ে দেবে বক্তৃতা করতে। বক্তৃতার চেয়ে কাজের উৎসাহই জয়ন্তর বেশী, এ কথা কেউ যেন বিশ্বাস করতে চায়না; তা না করুক, জয়ন্তর জীবনযাত্রা নূতনতর অনুভূতিতে স্পন্দমান হয়ে উঠলো। তার প্রত্যেকটি দিন এখন নব নব উত্তেজনায় রোমাঞ্চকর। জেলে যে হিন্দুস্থানী ছেলেটী কাগজে রাজদ্রোহজনক প্রবন্ধ প্রকাশ করবার অপরাধে তিনমাস তাদের সঙ্গে ছিল, হঠাৎ হয়তো সেই এসে হাজির। জয়ন্তকে নিয়ে সে যাবে তাদের মেসে। তারা শোনাবে ওকে হিন্দুস্থানী গান গেয়ে, জয়ন্তকে তার বদলে শোনাতে হবে বাংলা কবিতা। বাংলা গান শুনতে ছেলেটীর কি ভালো লাগতো! 'সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' শুনতে শুনতে আবেগে এবং উত্তেজনায় ছেলেটি একদিন কেঁদে ফেলেছিলো; জয়ন্তর আজও তা মনে আছে। এমনি করে জয়ন্তর পরিচয়ের সংখ্যা যখন প্রতিদিন বেড়ে উঠচে, সেই সময় কলকাতায় বসলো

স্বদেশী প্রদর্শনী এবং সেই সূত্রে জয়ন্তর সঙ্গে রেবার পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয় যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হবার উপক্রম করচে, ঠিক সেই সময় জয়ন্তকে আর একবার ধরা পড়ে হাজতবাস করতে হোলো মাস তিনেক। শেষ পর্য্যন্ত অভিযোগ গেল ফেঁসে, জয়ন্ত খালাস পেলো।

তিনটি মাস, মানুষের দীর্ঘ জীবনে কতটুকুই বা তার স্থান। কিন্তু মানুষের মনে এই তিনটি মাসের পরমায়ু বোধহয় অনেক! জয়ন্তর হাজতবাস যখন শেষ হয়ে এসেচে, সেই সময় রেবার কাছ থেকে একদিন ও চিঠি পেল, তারা চলেচে শিলং পাহাড়ে পিসিমাকে নিয়ে, পিসিমার হাওয়া বদলানো দরকার। কিন্তু সংবাদ দেওয়া ছাড়া সেটা আর কিছু নয়। শিলংএ পৌঁছে রেবা তাকে আব চিঠি লেখেনি। এক সময় তারা লুকিয়ে কোথাও পালাবার কল্পনায় রাত্রির মুহূর্ত্তগুলিকে রোমাঞ্চিত করে তুলতো, কলকাতার বাইরে গিয়ে রেবা কি তা ভুলে গেল? কিম্বা পিসিমাব অসুখই বুঝি বাড়াবাড়ি কে জানে!

ভদ্রতার খাতিরে জয়ন্তর অবশ্য যাওয়া উচিত ছিল একবার। কিন্তু সময় করে উঠতে পারলোনা কিছুতেই। একদিন অনেক রাত্রিতে যোধপুর ক্লাব থেকে বাড়ী ফেরবার পর ব্রজকিশোরবাবু হঠাৎ মারা গেলেন হার্ট ফেল করে। সংসারের সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে জয়ন্তব সময় লাগলো এবং ব্যাঙ্ক থেকে হিসেব আনিয়ে দেখলো, জমার অঙ্কের চেয়ে 'ওভারড্রাফ্‌টের' পরিমাণ অনেক বেশী—বসত বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক রেখে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েচেন। ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে বাড়ীখানা বিক্রী করে ফেলতে হোলো, তার পর একমাত্র বোন্ লীলাকে পাঠিয়ে দিল হোষ্টেলে এবং নিজে গিয়ে উঠলো একটা মেসে। এই সব ব্যবস্থা করতেই

কেটে গেল অনেকদিন। মেসে থেকেই জয়ন্ত একটা চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো।

ব্রজকিশোরের মৃত্যুর মাস পাঁচেক পর হঠাৎ একদিন জয়ন্তর সঙ্গে শীলাদির দেখা। বেঁটে ছাতাখানি বগলে নিয়ে শীলাদি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলেছিলেন। জয়ন্ত তাকে দেখে প্রায় লাফ দিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লো এবং একেবারে তাঁর সামনে এসে এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা জিজ্ঞাসা করে ফেললো:

আপনার বন্ধুর খবর কি শীলা-দি—I mean আপনার বন্ধু রেবার। সে শিলংএ যাওয়া পর্য্যন্ত তার কোন খবর পাইনি। ভালো আছে তো রেবা? তার পিসিমা নিশ্চয় এতদিনে ·

কিন্তু শীলাদি অত্যন্ত অরসিক। বেটে ছাতাটা ঘুরোতে ঘুরোতে তিনি বললেন, আমিও মাস চারেক তার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি।

—কিন্তু এ অন্তর্দ্ধানের রহস্য কি বলতে পারেন? চিঠি দিয়ে ঠিকানাটা জানালেই বা কি ক্ষতি হোতো?

—ডাকঘরের আয় বাড়তো বলে বোধহয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যিই অনেক দিন তার খোঁজ পাইনি। মাঝে আমার এক বন্ধু সেখান থেকে ফিরে এসে বলেছিল, রেবা নাকি শিলং পাহাড়ের তুষার গলিয়ে একেবারে উষ্ণতার স্রোত বইয়ে দিয়েছে। She is the spirit of the mountains there! নবাগত একজন I. C. S. অফিসারের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও নাকি ঘটেছে। But of course, you don't believe that!

জয়ন্ত হেসে বলেছিল: Certainly not আমি জানি রেবা সে মেয়ে নয়।

শীলাদি আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেননি, মিষ্টি একটু হেসে গন্তব্যপথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শীলাদি চলে যাবার পর জয়ন্ত মনে মনে বলেছিল: হাউ ফানি! এ হতে পারেনা, একেবারে অসম্ভব!

দিন কাটতে লাগলো। কোন সম্বন্ধ নেই রেবার সঙ্গে, কিন্তু কোথা থেকে আসে এত মধুর অনুভূতি, এত রোমাঞ্চ? জয়ন্ত আশা করে, একদিন তাদের দেখা হবে। আকাশের জ্যোতির্মণ্ডলে সেদিন হয়তো কোন বিশৃঙ্খল ঘটবেনা, কিন্তু দেখা তাদের হবে। হয়তো কোন অলস অপরাহ্নে আউটরাম ঘাটের জেটিতে, কিম্বা ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ের আসরে, কে জানে! তাইতো এই নিঃসঙ্গতার মাধুর্য্য আজ কিছুতেই নিঃশেষ হয় না। সমস্তদিন নানা মানুষের, নানা চিন্তা ও নানা কথার ভিড়ের মধ্য থেকে অনেক রাত্রিতে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসার মধ্যে কোথায় যেন ঐশ্বর্য্যবোধের ভাব আছে। যাদের সঙ্গে অনুক্ষণ মেলামেশা, তারা বোঝেনা এই প্রত্যাবর্ত্তনের গভীরতর অর্থ। আসামের এক পাহাড়-ঘেরা শহরের বাংলোয় বসে, সামনের কুয়াসাচ্ছন্ন দেবদারু শ্রেণীর দিকে চেয়ে একটী মেয়ের চোখের পাতা তাতো বাষ্প ও বেদনায় ভার হয়ে এলো, এ খোঁজ শুধু জয়ন্তই রাখে। কে জানে শিলংএর শীতশিহরিত রাত্রিগুলি কত মধুর, কত গভীর!

এ কথা স্বীকার করতে জয়ন্ত লজ্জা পেলনা যে রেবাই তার জীবনের প্রথমা নায়িকা। ওর মস্তিষ্কের মধুচক্রে উঠলো অশ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন, আকাশে আকাশে লেখা হোলো বিচিত্র রংএর আলিম্পন; সব যেন বদলে গেল, মাটী আর বাতাস হোলো মদির। রেবা তার জীবনের তপস্যায় মূর্ত্তিমতী আশীর্ব্বাদ হয়ে এলোনা, সে এলো মানুষের কামনার প্রথম জাগরণ

হয়ে, বাসনার প্রথম ফুল হয়ে, শোণিতের প্রথম স্বাদ হয়ে, নিশ্বাসের প্রথম উষ্ণতা হয়ে, অকারণ উল্লাসের প্রলাপ হয়ে…

ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়েব আসর নয়, আউট্রাম ঘাটের জেটীতে নয়, শিলংএর কোন নির্জ্জন বাংলোতে নয়, একেবারে বিহারের রাজপাট পাটনা সহরে।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়ে আসচে। প্রকাণ্ড একটি ড্রয়িং রুম, বিচিত্র কারুকার্য্যের লেস দিয়ে চারিদিক ঢাকা। মিউজিক টুলের উপর বসে রেবা পিয়ানোয় কি-একটা সুর তোলবার চেষ্টা করছিল। কয়েক মিনিট পরে ঘরে ঢুকলেন পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাকপরা এক ভদ্রলোক। বেয়ারা এসে তাঁর হাত থেকে টুপীটা নিয়ে রাখলো হ্যাট্-র‍্যাকের উপর। ভদ্রলোক একটা চেয়ার দখল করে বসলেন। রেবা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললো: আমি মিটিংএ যাচ্চি।

কিসের মিটিং? কোথায়?

স্বদেশী সভা। বাংলা থেকে নেতারা এসেচেন, টাউন হলে আজ বক্তৃতা।

ভদ্রলোক সর্ব্বাঙ্গে বিস্ময়ের ঢেউ তুলে বললেন: বলো কি! ম্যাজিষ্ট্রেটের বউ হয়ে তুমি যাবে স্বদেশী-সভায়!

রেবা বললে, no silly sallying—তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট তো আমার কি!

ভদ্রলোক বললেন, quite reasonable. কিন্তু যাবার আগে স্বহস্তে এক পেয়ালা কোকো খাইয়ে যাও।

রেবা যখন সভা থেকে ফিরে এলো তখন আর সে একা নয়! খদ্দরের কাপড় আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা জয়ন্ত তার সঙ্গে। দেখা তাদের

হোলো শেষ পর্য্যন্ত, বছর দুই পরে। ইতি মধ্যে জয়ন্ত প্রায় নেতা হয়ে উঠেচে। চুলগুলো যেমন বড়, তেমনি রুখু। ছয়ফুট দীর্ঘ সেই চেহারার দিকে চেয়ে গৃহস্বামী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ঘরে ঢুকেই রেবা বললে, কাকে নিয়ে এলাম দেখেচো?

সাহেব চশমাটী চোখ থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ জয়ন্তর দিকে বিব্রত ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কই, চিনতে পারলাম না তো?

পিয়ানোর রিড্গুলোর উপর দিয়ে দ্রুতবেগে আঙ্গুল চালিয়ে গেলে যেমন ঝঙ্কার ওঠে, তেম্নি খিল্ খিল্ করে রেবা হেসে উঠলো; বললে, তা চিনবে কেন! most incompetent civil servant! বাংলা মুলুকের জয়ন্ত রায়কে চেনো? Political terror, খাঁটী কর্ম্মী। আমার বন্ধু।

সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শেষ কথাটাই আসল পরিচয় and a compliment too. হাকিমের বাসা হোলেও আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। বসুন, বসুন। এই বয়—

ভদ্রলোকের বয়স বিশেষ অল্প নয়, প্রায় চল্লিশ! একটু জোরে কথা বললেই কপালের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। মাথার সামনের দিকটা টাক, সেই জন্যেই তা অত্যন্ত সহজে চোখে পড়ে। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই রেবা বললে, থাক, তোমাকে ব্যস্ত হয়ে আব ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়ে তুলতে হবে না। জয়ন্তকে আমিই ম্যানেজ করতে পারবো, এসো জয়ন্ত।

পাঁচ মিনিটেব জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে বলে বেবা পাশের ঘরে গেছে বেশ পরিবর্ত্তন কবতে। এই পাঁচটি মিনিট জয়ন্তর কাছে কি অস্বস্তিকর! নিঃশব্দ প্রতীক্ষাব এই অবসবেব মধ্যেই জয়ন্ত চেয়ে চেয়ে

দেখলো ঘরের সামান্যতম আসবাবগুলি পর্য্যন্ত। রুচি আর প্রাণ নেই। ছবিগুলো পর্য্যন্ত তোলা এবং বাঁধানো হয়েচে সাহেবী দোকান থেকে। চারিদিক আয়নার মতো ঝকঝকে, কেউ যেন এ বাড়ীতে অসাবধানে চলা ফেরা করে না, ধূলোমাখা পায়ে কার্পেট-মোড়া এই ঘরে তার প্রবেশ যেন ১২৪ ক ধারা অমান্য করার চেয়ে বড় অপরাধ!

কিন্তু এই তো রেবার ঘর। ড্রেসিং টেবলের উপর প্রসাধন দ্রব্যের ভিড় দেখে জয়ন্ত অনায়াসে তা কল্পনা করে নিতে পারলো। কিন্তু ঘরের সবটাই যেন আত্মপ্রচারের কুশ্রিতায় রূঢ়—পেনাল কোডের ধারার মতো স্পষ্ট, হৃদয়াবেগহীন।

রেবা ফিরে এলো! ঘরে ঢুকেই বললে, চা আনতে বলেচি। হাকিমের বাড়ীতে চা খেতে আপত্তি নেই তো?

জয়ন্ত বললে, না, যখন আসামী হয়ে আসিনি।

জয়ন্ত আরও কি যেন বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। রেবা কাছে এসে বসলো; কিন্তু খুব কাছে নয়। কতখানি কাছে বসলে হাকিমের স্ত্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, সে সম্বন্ধে রেবার ধারণা খুব প্রখর বলে মনে হোলো। কতটুকু দূরে বসলে প্রসাধনের সুগন্ধে পার্শ্ববর্ত্তীদের চঞ্চল করে তোলা যায় সে সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মেচে বলতে হবে। জয়ন্ত তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, মুহ্যমান চেতনা দিয়ে রেবার দেহ-নির্গলিত সুগন্ধ-সুরভি পান করে যেন অবসন্ন হয়ে পড়লো। অনেক কথা তার বলবার ছিল, অন্ততঃ তাই সে ভেবেছিল; কিন্তু এখানে এসে দেখা গেল, কেউ ভাত খেতে বসেচে দেখে কি রান্না হোল, এ প্রশ্ন করার মত সেই সব কথা বলার কোন অর্থ হয় না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, চললাম রেবা—

যে মেয়ে দশমাস গর্ভে সন্তান ধারণ করে মৃত শিশু প্রসব করে তার মুখের দিকে কখনও চেয়ে দেখেছেন? চেতনা লাভের পর মৃতবৎসা জননীর কণ্ঠস্বর শুনেচেন কখনও? জয়ন্তর চলে যেতে চাওয়ার মধ্যে যেন সেই সুর ছিল।

রেবা কিন্তু মোটেই বিচলিত হোলো না। বললে, হঠাৎ কি এমন জরুরী কাজ মনে পড়ে গেল? আজ রাত্তিরে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই, তাও ভুলে গেলে না কি?

জয়ন্ত বললে, না। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে এসেচি তাঁরা কি ভাববেন বলো তো? না, সত্যিই আমি চলি—

রেবা এবার উঠে দাঁড়ালো; বললে, কেন, এখানকার আবহাওয়া কি সহ্য হোলো না? ভালো লাগলো না আর?

জয়ন্ত এবার হাসলো। বললে, তোমার সঙ্গে দেখা হোলো, কয়েকটি অর্থহীন মুহূর্ত্ত তোমার সঙ্গে কাটালাম, এইতো ভালো। সামাজিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে তাকে নতুন করে ভালো নাই লাগালে! তোমার সঙ্গে আমার কেবল ভদ্রতার সম্বন্ধ ছিল না।

রেবার মুখে ছায়া পড়লো, কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য? মাথা উঁচু করে জয়ন্তর সামনে দাঁড়িয়ে রেবা বললে, সে কথাও এখানকার কোন সভায় প্রচার করে যাবে না কি? তা হোলেই স্বদেশিয়ানার চূড়ান্ত হোত!

জয়ন্ত চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়ে কোন মতে বসে পড়লো। বললে, তাতে আমারও বড় কম কলঙ্ক রটতো না; এ বয়সে ছেলেমানুষী করতে ভয় পাই!

এর পর ঘরের মধ্যে রইলো শুধু কদর্য্য, খণ্ডিত নীরবতা, ঘড়ির

হার্টবিট্, ফ্যানের একঘেয়ে শব্দ! রেবার হাতদুটি তার কোলের উপর, জয়ন্ত দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে চেয়ে। কিন্তু ছবি জয়ন্ত দেখেনি। দেওয়ালের গায়ে ভূমিকম্প হচ্চে: ভেঙে পড়চে অনেক দিনের স্মৃতি আর বিস্মৃতি দিয়ে তৈরী একটা পৃথিবী, ভেঙে পড়চে শত সহস্র কর্ম্মেব প্রেরণা, শেষরাত্রির বিচিত্র বর্ণের আকাশ যেন দিনের আলোয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্চে।

বেয়ারা চা নিয়ে এলো। রেবা উঠে চা ঢেলে দিল নিঃশব্দে। জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে পেয়ালা তুলে নিল নিঃশব্দে, কিন্তু মুখের কাছে না তুলে বললে: আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

রেবা জয়ন্তর দিকে চাইলে।

কেন?

তোমার খেলাকে আমি seriously নিয়েছিলাম বলে। সে দোষ তোমার নয়। তবু তোমাকে আমি হয়তো ক্ষমা করতে পারবো না। তুমি আজ অন্যের স্ত্রী বলে নয়। তুমি আমার জীবনের প্রথম বঞ্চনা, তাই।

রেবা চুপ করে রইলো।

জয়ন্ত আবার বললে: জীবনে তুমি অনেক প্রেম করেচ, এ কথা আগে জানতাম না। কিন্তু অনেক পুরুষের কাছে তুমিই ছিলে প্রথম, আমার কাছেও তাই—এ কথা তুমিও জানো না; জানা তোমার পক্ষে আবশ্যকও ছিল না। নানাবিধ এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে দিয়ে তুমি সংগ্রহ করেচ ঐশ্বর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য। আর আমাদের মত যারা ছিল তোমার নিশ্চিন্ততার এই তীর্থে পৌছবার কয়েকটা ধাপ মাত্র, তারা তোমার পদচিহ্ন বুকে জড়িয়ে পিছনে পড়ে রইলো। তুমি রাগ করো না, কিন্তু এ

ছাড়া তোমার ব্যাখ্যা নেই। তোমার সঙ্গে আমার আজকের এই দেখা হওয়াটা শুধু বিড়ম্বনা।

রেবার মুখে এতক্ষণে কথা ফুটলো, বললে, যা চেয়েচি তার সবটুকুই আমি পেয়েচি, একথা তোমাকে কে বললে জয়ন্ত? এও একটা experiment. তা ছাড়া, পরিচয় রাখারও কি কোন দাম নেই জয়ন্ত?

জয়ন্ত বললে, সত্যি নেই। ফার্ষ্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করবো ভেবে, কোন মতে ফেল্ না করার কোন দাম নেই। স্ত্রীলোকে আর পুরুষে যাই হোক, বন্ধুত্ব হয় না; সেটা ভেজাল। তুমি যদি আমাকে আজ জোর করে টেনে না আনতে, আমাদের যদি আর দেখা না হোতো, তবু আমি স্বপ্ন নিয়ে থাকতে পেতাম। তোমাদের শিলংএর যে বাড়ী আমি কথনও দেখিনি, তা এমন করে হাওয়ায় উড়ে যেত না,—তুমি আমার মনে মনে চিরকাল সেখানে বসে আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে। কিন্তু আর না, বক্তব্য ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠচে, আমি চললাম।

চেয়ারে একটা অস্বাভাবিক ঝাঁকুনী দিয়ে জয়ন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো, সিলিং থেকে কার্পেট-বিছান মেঝে পর্য্যন্ত। তারপর রেবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে এনে, খাঁটী বিলিতি কায়দায় করলে হ্যাণ্ড্শেক। যাবার সময় বললো: তুমি ঠিক করেচ রেবা। বাসা যদি বাঁধতে হয়, তা পাঁচজনকে দেখাবার মত হওয়াই ভালো। পাখা যখন গুটোতে হবে, তখন সোণার খাঁচা নইলে চলবে কেন?

এ সব অনেক দিনের কথা, অনেক দিনের। কতকাল কেটে গেছে তারপর, বাংলা ছেড়ে এসেচে, চাকরী পেয়েচে লাহোরের কলেজে। সেও কি আজ কমদিনের কথা! তবু নিজের মনের মধ্যে কোথায় যেন আজও

খানিকটা দুর্ব্বলতা সঞ্চিত হয়ে আছে এই বিস্মৃত ইতিহাসটিকে ঘিরে। একটী মাত্র নারীদেহকে কেন্দ্র করে এতখানি বিস্ময় সঞ্চিত ছিল তার জন্যে এ কথা ভাবতে জয়ন্তর রাগ হয়, লজ্জা হয় এবং আনন্দ হয় কখনও কখনও। হয় তো সাত দিনের মধ্যে একবার মনেও পড়ে না এ সব কথা, তারপর হঠাৎ একসময়, যেন দমকা বাতাসে অতীতের তীর থেকে ভেসে আসে স্মৃতির সুবাস, মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে মানস-অরণ্য !…কিন্তু জয়ন্ত এই দুর্ব্বলতার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না, ঘৃণা হয় নিজের সম্বন্ধে, সত্যি, কেন সে এতদিনেও এই দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলো না ? সত্যি, কি ছিল সেই অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে, কি ছিল স্বার্থসর্ব্বস্ব সেই মেয়েটীর দেহভঙ্গিমা আর কণ্ঠের ধ্বনিতে ?

নিজেকে নানা রকমে বিশ্লেষণ করেও জয়ন্ত যেন এই প্রশ্নের সমুদ্র পার হতে পারে না। দিনের পর দিন চলে গড়িয়ে। ভাগ্যি, হাজার রকম কাজ আর অকাজ ছিল জয়ন্তর জন্য, তাই দিনগুলো কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া চলে !

কলকাতা থেকে ফিরে এসেও জয়ন্তর জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভাল লাগে নি মেসের সেই অতি-পরিচিত জীবন, কিন্তু তার পরে আবার সব সহ্য হয়ে গেচে। অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের অদ্ভুত, নইলে পৃথিবীতে আজও যেটুকু শান্তির সন্ধান মেলে তাও কোন্‌কালে কর্পূরের মতো হাওয়ার সঙ্গে মিশে যেত !

সে দিনটা ছিল ছুটী, কলেজে যাবার তাড়া নেই, জয়ন্ত দুপুর বেলায় বিছানায় পড়ে একটা প্রবন্ধের খসড়া তৈরী করছিলো

মনে মনে। সমাজ-সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে দু একটা প্রবন্ধ সে লিখেও থাকে।

চাকরটা এসে চিঠি দিয়ে গেল। তারই চিঠি, লিখেচে লীলা। এই তো দু দিন আগে লীলার কাছ থেকে চিঠি এসেচে, এর মধ্যে আবার—?

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি খাম খুলে চিঠিখানা পড়তে সুরু করলে। একবার পড়ে ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারলে না; তবে এটা ঠিক যে মনে মনে যে প্রবন্ধের খসড়া রচনা করছিল এতক্ষণ ধরে, তার খেই হারিয়ে গেল। আবার চিঠিখানা পড়তে সুরু করলে গোড়া থেকে :

অনেক ভেবে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে সব কথা জানানো উচিত মনে করলাম। ললিতার প্রতি কেতকীর মনের ভাবটা ঠিক প্রসন্ন নয়, এ কথা তোমাকে আগেই লিখেছিলাম। সম্প্রতি ব্যাপারটা রীতিমত ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েচে। ললিতার সঙ্গে অনুপমের একটু ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল, কেতকী সেটুকু সহ্য করতে না পেরে অনুপমের আসা বন্ধ করেচে। তবু তোমায় কিছু জানাই নি, কিন্তু এবারের ব্যাপার আরও জটিল। সুকুমার কিছুকাল দক্ষিণা-নিবাসে আসে নি, হঠাৎ সেদিন এসে দেখে ললিতা বাড়ীতে একা। দুজনে কথাবার্ত্তা কইচে এমন সময় কেতকীর আবির্ভাব। কেতকী আবার একটা বিশ্রী ব্যাপার সন্দেহ করে দুজনকে কটূক্তি করে; সুকুমারও তাকে ছেড়ে কথা কয় নি। ওবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে এসেচে বললেই হয়। এখন ললিতাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে তার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। এমনি দুর্ভাগ্য ওর যে চিরকাল শুধু কলঙ্কই কুড়িয়ে গেল, কোথাও শান্তিতে কাটাতে পারলো না। সত্যি দাদা, তুমি যখন ওকে এখানে নিয়ে এলে, তখন আমি মোটেই খুসী হতে পারি নি। তবু চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এখন যা ঘটলো তাতে চুপ করে থাকাটা অন্যায় বলেই তোমায় চিঠি লিখলাম। কি করবে৷ জানিয়ো। আর একটি কথা তুমি শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবে। সুকুমার ললিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি ললিতাকে সে কথা জানিয়েছিলাম;

শুনে সে আমার কোলে মুখ লুকিয়ে শুধু কাঁদতে লাগলো, কোন কথা বললে না। সুকুমারকে ও ভালবাসে। কিন্তু তাদের বিয়েতে অন্তত আমার মত নেই জেনো। কারণ, যেমন হঠাৎ ললিতা সম্বন্ধে সুকুমারের মনে উৎসাহ দেখা দিয়েচে, তেমনি হঠাৎ সে উৎসাহ ফুরিয়ে যেতে পারে। অন্তত আমার এই বিশ্বাস। অনেকটা এই অবস্থায় এক ভদ্রলোক সেদিন আমার কাছেও বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁকে আমার ভাল লাগে, এ কথা তোমার কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কিন্তু এতখানি সাহস আমার নেই যে তাঁকে নিয়ে চিরকাল সংসার করতে পারি। একদিন মেয়েদের সম্বন্ধে তোমায় কতকগুলো অপ্রিয় কথা বলেছিলাম। সেদিন তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে এত কথা শিখলাম কোথায়? সেই জন্যেই তোমার কাছে আজ এ কথা বলতে পারলাম। নিজের জীবনেই অনেক কথা বোঝবার সুযোগ ঘটেচে—এ কথা তোমার কাছে আর লুকোবো না। কিন্তু এত বুঝেও নিজের সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হোতে পারি নি, নিজেকে নিয়ে প্রতিপদে ভয় পাই। যা নিজের সমস্ত চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করি, কাজে তা করি না; বিশ্বাস নেই যে বস্তুতে, জীবনে বারম্বার ঘটিয়ে তুলি তাই। এই আত্ম-অবিশ্বাসই হয়তো আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। এ থেকে আমাদের মুক্তির কি কোন পথ নেই? ..

লীলা আরও অনেক কথাই লিখেচে ছ' পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিতে। আর একবার জয়ন্ত সমস্তটা পড়ে ফেললো। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চোখ বুঁজে পড়ে রইলো ঠিক তেমনি করে, বোধ হয় এক ঘণ্টাই হবে। তার পর যখন উঠে বসলো বিছানা ছেড়ে তখন বেলা আর নেই। মেসের সামনের বারান্দায় জয়ন্ত খানিকটা ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। একে একে আলো জ্বলে উঠচে পথের দু ধারে। জয়ন্ত প্রবন্ধ লেখবার উৎসাহ খুঁজে পাচ্চে না কিছুতেই। লীলার চিঠির জবাব দিতে হবে, কুড়েমি করে ফেলে রাখলে চলবে না। কলকাতা থেকে প্রবন্ধের তাগিদ আসবে আবার, কিন্তু জয়ন্ত তার কি

করতে পারে ? লেখার mood না থাকলে জোর করে জয়ন্ত লিখতে বসে না। আরও কিছুক্ষণ জয়ন্ত ঘুরে বেড়াল বারান্দায় ; তার পর ঘরে যখন ফিরে এলো, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেচে। সুইচ্ টিপে জয়ন্ত আলো জ্বাললো, তার পর প্যাড আর ফাউণ্টেন পেন্ নিয়ে বসলো চিঠি লিখতে। ঠিক বসলো বলা চলে না, কারণ, জয়ন্তর ঘরে টেব্‌ল চেয়ারের বালাই নেই। প্রকাণ্ড একটা চৌকীই তার ঘরের একমাত্র আসবাব। তারই এক ধারে রাশীকৃত ইংরিজী-বাংলা বই, খাতা, কলম, দোয়াত, মোমবাতির কতকগুলো টুকরো. অর্দ্ধনিঃশেষিত চুরুট অনেকগুলি এবং এই ধরণের আরও অনেক কিছু। তা ছাড়া জয়ন্ত আবার বসে বসে লিখতে পারে না কিছুতেই ; পা দুটো বেশ টান করে দিয়ে, উপুড় হয়ে বিছানার উপর পড়া চাই, মাথার বালিশটা রাখা চাই ঠিক বুকের নিচে, তার পর জয়ন্ত লিখতে পারে কিছুক্ষণ, নইলে কিছুতেই ও এসব কাজে মন দিতে পারে না। সুতরাং জয়ন্ত চিঠি লিখতে ঠিক বসলো না, একথা বোধ হয় বলা চলে।

জয়ন্ত লিখলে :

সুচরিতাসু,

লীলা. তোমার চিঠি পেলাম। মনে মনে চিঠির প্রত্যাশা করি নি, তাই আগেই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, চিঠি পড়ে আরও আশ্চর্য্য হলাম। কোন্‌খান থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে সুরু করবো, ঠিক বুঝতে পারচি না। ললিতাকে নিয়ে দক্ষিণা-নিবাসে যে ঝড় উঠেচে, তার পর তাকে সেখানে রাখা যে যুক্তিযুক্ত নয়, এ কথা আমিও স্বীকার করি। ভবিষ্যতে তার পথ কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে তোমায় কি লিখবো তাই

ভাবচি। তোমার চিঠিখানা আমায় রীতিমত ভাবিয়ে দিয়েচে, এ কথা বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না। ললিতাকে দক্ষিণা-নিবাসে পৌছে দিয়ে রীতিমত একটি সমস্যা সৃষ্টি করেচি, তাও এতদিনে বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু তার চেয়ে ভাবিয়ে তুলেচিস তুই নিজে। একটি বিরাট সমস্যা গড়ে উঠেচে চারিদিক দিয়ে এবং তুই, আমি, ললিতা, কেতকী—সবাই তার এক একটা দিক। চিঠি লিখতে বসে সেই কথাই আজ মনে হচ্চে বেশী করে। চিঠিতে সমস্যার সমাধান করতে বসি নি, সে ক্ষমতাও নেই, তবু সমস্ত বিষয়টা যেমন করে আমার মনকে নাড়া দিয়েচে, সে সম্বন্ধে দু একটি কথা যদি লিখি, তুই অন্ততঃ সেগুলো ধৈর্য্য ধরে পড়বি বলে আশা করতে পারি।

পৃথিবীতে আজ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধুয়া উঠেচে এবং নারীর মূল্য সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত হঠাৎ খুব বেশী রকম সচেতন হয়ে উঠেচি। আমি নিজেই এই দলের একজন প্রধান পাণ্ডা, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জিত নই। মানুষের কল্পনার পৃথিবীতে যে রমণী শুধু দেবী কিম্বা দাসীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাকে আমরা আজ আর চাইনে। পৃথিবীর বহু যুগের বহু কবি ও দার্শনিক তাঁদের শব্দ ও ভাবসম্পদ দিয়ে স্ত্রীজাতির চারিপাশে যে স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তা আর টি`কে থাকতে পারচে না, পুরুষের আধিপত্য-বোধও যেন অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেচে—অন্ততঃ আমরা এ কথা বহুদিন ধরে জোর গলায় প্রচার করে আসচি। মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন আমাদের। আমরা লোকমুখে শুনচি এবং স্বচক্ষে দেখচি, মেয়েরা আজানুলম্বিত কৃষ্ণকেশপাশের মায়া ত্যাগ করে 'বব্' করতে শিখেচে, ঢিলে পায়জামা এবং পুরুষালী পাদুকা ব্যবহার করতেও

তারা কুণ্ঠিত নয়। এ থেকে আমাদের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে স্ত্রীজাতি এতদিনে জীবনের মূলমন্ত্র খুঁজে পেয়েচে। আমরা কাণ পেতে শুনচি, রাশিয়ার মেয়েরা সুনীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গ একেবারে মুছে ফেলেচে, যৌন সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের কোন আইন নেই ওদের দেশে, ব্যভিচারের অভিযোগ টেঁকে না সেখানে—এক কথায়, কল্পনার স্বর্গ তাদের মুঠির মধ্যে এসে পড়েচে। আধুনিকতাবাদী Keyserling বলচেন :

Lying on its death-bed in Europe love has become openly unmodern···from now on love is to exist no more.

প্রেমের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেচে, আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার নাভিশ্বাস উঠবে,—এ ধুয়ো ইয়োরোপ পার হয়ে সম্প্রতি আমাদের দেশেও এসে পৌঁছেচে। আমরা আধুনিককালের মানুষ, যুগধর্ম্ম আমাদের অস্থিতে এবং মজ্জায়, আমরা তাকে এড়িয়ে যাব কি করে? লেনিন বলেছিলেন, যে জাতের অর্দ্ধেক লোক রান্নাঘরের বন্দী, সে জাত কখনও স্বাধীন হতে পারে না। লেনিনকে আমরা আধুনিক পৃথিবীর গুরু বলে মানি, অতবড় স্বপ্নবিলাসী আর জন্মায়নি। তাঁর মুখের কথা শোনবার পর, এ দেশের মেয়েরা রান্নাঘরের বেড়া টপ্‌কে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করচে—সে হাওয়ায় রয়েচে সমুদ্র পারের সুর, তুষার-আচ্ছন্ন একটি দেশের নতুন নতুন মতবাদ। কিন্তু এটুকু তোকে বলে রাখা দরকার যে, রাশিয়ার পক্ষে আজকের এই 'এক্সপেরিমেণ্ট্' একেবারে নতুন নয়। নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য অন্যান্য দেশ যেমন নানাপ্রকার বিধি নিষেধ খাড়া করে রেখেছিল, রাশিয়া তা করেনি। পুরুষ ও নারীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সেখানে বহুকাল থেকেই নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই এক্সপেরিমেণ্টের নূতনত্বের ধাক্কা সামলানো একটু কঠিন নয় কি?

অবশ্য, আমাদের দেশেও এককালে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেচে, শিক্ষার বিষয় তো বটেই—ক্ষণা, গার্গী, মৈত্রেয়ী এর উদাহরণ। এমন কি পতি-নির্ব্বাচন ব্যাপারেও তারা যে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এসেচে, তাও বোধ হয় অন্যান্য জাতির পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। আমি স্বয়ম্বর-প্রথার কথা বলচি। কিন্তু দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে সে আদর্শ আমরা বেমালুম বিস্মৃত হয়েচি, নাটক এবং কাব্যে ছাড়া তার স্মৃতি পর্য্যন্ত নেই। এ বিষয়ে মুসলমানরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেচেন বললে অপরাধ হয় না। জেনানা সম্বন্ধে তাঁরা ভারি strict, আমরাও তাঁদের দেখাদেখি সেটা মজ্জাগত করে ফেলেচি। তাই এতদিনের অভ্যাস হঠাৎ একদিনে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। অথচ, আমরা রাতারাতি innovation না করে ছাড়বো না, তাই ত্রুটি দেখা দিচ্চে বহুৎ। পরিবর্ত্তন ভেতর থেকে আসেনি মোটেই, বাইরের সমারোহ আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়েচে। এই তোমার বন্ধু কেতকীর কথাই ধরো। শিক্ষায়, আলাপে, ব্যবহারে ওর মতো আধুনিক মেয়ে আমরা সচরাচর কমই দেখি, কিন্তু কি হোলো তাঁর এই বাইরের পরিবর্ত্তনে? মনে মনে আজও তিনি সাবেককালের কতকগুলো পচা ধারণা নিয়ে পড়ে রয়েচেন, তাঁর সেদিকটা পল্লী-বৃদ্ধাদের মতো সন্দেহে সঙ্কীর্ণ এবং কুৎসিত। অবশ্য, এর সব দোষ শুধু কেতকীর ঘাড়ে চাপিয়ে আমি তাঁর সম্বন্ধে অবিচার করবো না। দোষটা কতক আমাদের পারিপার্শ্বিকতার। স্ত্রীপুরুষের যে সম্পর্কটা আমাদের দেশে আদর্শ হিসেবে চলে আসচে, তা স্থূলতম স্বার্থ এবং নিরুপায় দেহগত সম্বন্ধের আদর্শ! 'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' এতো আমাদের দেশেরই কথা এবং স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিচারে আমরা এই logical fallacyটা অত্যন্ত বেশীরকম কাজে লাগাই।

এইবার ওদেশের মেয়েদের কথা বলি। তারা যেমন সিনেমায় যায়, থিয়েটার দেখে, ঠিক তেমনি ভাবে পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। Boy friend কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে ওদের মেয়েরা সহজ বন্ধুত্ব করতেও জানে। যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সভায় আলোচনা হয় সেখানে মেয়েরা উপস্থিত থাকে দলে দলে। বক্তৃতা করেন পুরুষ, তারা সে বক্তৃতা শোনবার সময় শাদা গাল রাঙা করে তোলে না। যৌন বিষয়ে গোপনতা তারা পরিহার করে আসচে অনেক দিন থেকে। আমাদের দেশে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আমাদের পল্লীগ্রামে হঠাৎ একটি ছেলে যদি ঘন ঘন বারকতক একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে, তা হলে সেটা রীতিমত পল্লবিত হয়ে বাতাসের বেগে গ্রামের চারিপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে' ঘোঁট বাধিয়ে তোলে। এই বিষয়ে ওদের দেশের লোকের মনের প্রসার স্বভাবতঃই আমাদের চেয়ে বেশী, সুতরাং তারা যা অল্পকালের মধ্যে গ্রহণ করেচে, আমাদের তা পরিপাক করবার পূর্ব্বে দু'এক যুগ সময় লাগবে বইকি।

রাশিয়ায় আজ যে পরিবর্ত্তন ঘটেচে তাও ইয়োরোপের লোক সহজে পরিপাক করে নিতে পেরেছিল মনে করো না। ১৯২০ সালে, এমন কথাও লোকে বলতো যে সমস্ত রাশিয়া public house হয়ে দাঁড়িয়েচে। কিছু কিছু অমিতাচার যে সে সময় রাশিয়ার যৌন-জীবনে ঘটেছিল, তা এত দূরে বসেও আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ, সমাজ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া একটা থাকেই। অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের স্রোতে জল ওঠে ঘুলিয়ে। কিন্তু সমস্ত রাশিয়ার নারীজাতিকে সেদিন যাঁরা পৃথিবীর চোখে নিন্দিত করেছিলেন, তাঁরাও যে সত্যি কথা প্রকাশ করেন নি, এটাও ঠিক। ইদানিং যাঁরা সেখান থেকে ফিরে এসেচেন, তাঁদের মুখে আমরা শুনেচি,

একদা সত্যিই যদি জল ঘুলিয়ে উঠে থাকে, আজ তা আবার স্বচ্ছ হয়ে এসেচে। আমাদের দেশেও যদি কোনদিন সমাজ-বিপ্লব ঘটে, কালের রথচক্র যদি ছুটে যায় এই বহুকালের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর দিয়ে, আমরাও হয়তো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়বো। কিন্তু তার জন্যে অন্ততঃ আমি ভয় করিনে; ঝড়ের রাত্রির পর আবার সদ্যঃ সূর্য্যোদয় হবে। পরিবর্ত্তন যদি ঘটে, তার দামও দেওয়া চাই। স্বাধীনতা যুদ্ধেও মানুষ মরে। মস্কো এবং লাএঞ্জলিসের বিবাহ-বিচ্ছেদ-আদালতের মামলাগুলোর জন্যে আমি তাই ভয় পাইনে, ওগুলো নবসভ্যতার দাম। আজ যা অত্যন্ত চড়া দরে বিকোয়, একদিন তা সহজলভ্য হবে, এমন আশা হয়তো দুরাশা নয়।

কিন্তু এত আমাদের জীবনের বৃহত্তর সমস্যা, এ সমস্যা জাতের কিম্বা সমাজের, যাই বলো। এদিকে আমাদের নিজেদের জীবনের গ্রন্থিগুলো যে তার চেয়ে জটিল হয়ে উঠচে। অন্ততঃ তোর চিঠি পড়ে সে কথা আমার অস্বীকার করবার উপায় নেই। চিঠি পড়ে বুঝলাম, মানুষের সম্বন্ধে তোর বিশ্বাসের গোড়ায় কোথায় যেন ঘা লেগেচে, যে ছেলেটির কথা চিঠিতে উল্লেখ করেচিস এত ঘটা করে, তাকে তো চিনি; কিন্তু তার আগের ইতিহাসটা রয়ে গেচে অপ্রকাশ। বড় ভাই হয়ে সে কথা স্পষ্ট করে জানতে চাওয়া হয়তো একটু দৃষ্টিকটু। তবু, সেটুকু অনুমান করে নিতে—সম্ভবতঃ আমার ভুল হয়নি। ভুল হয়নি তার কারণ, তেমনি একটা আঘাত নিজেও পেয়েছিলাম একবার, অনেকদিন আগে; আজও তার জের টেনে চলেচি। চিঠিতে সে কথা ছোটবোনকে জানাতে আমার দিক থেকে সঙ্কোচের কোন হেতু ছিল না, কিন্তু তাতে চিঠিখানা ছোটখাট একখানি উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা। সে কথা পারিতো সামনা-সামনি বলবো একদিন। আজ এই পর্য্যন্ত বললেই বোধকরি যথেষ্ট

হবে যে জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করে এ যুগের বিষ আমরা দুজনে আকণ্ঠ পান করেছি। কথাটা রীতিমত কবিত্বপূর্ণ হলো বটে, যে লোক অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব ঘেঁটে দিন কাটায়, তার কলমে এরকমের লাইন হয়তো অমার্জ্জনীয়, কিন্তু কথাগুলো খাঁটি সত্যি।

আমরা ভালবেসেচি এবং হারিয়েচি, তুমি আর আমি, এ যুগের ভাই আর বোন, মেয়ে এবং পুরুষ। একদিন ভালবাসার ভাষা ছিল অন্য, রীতি ছিল স্বতন্ত্র। সেদিন ভালোবাসা মানুষকে সুস্থ করতো, সবল করতো; মহত্তর প্রেরণা আনতো প্রাণে; ভালবেসে মানুষ সন্ন্যাসী হতো, এমন কথাও শুনেচি। এখনও এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কারও কারও ঘটে; সংখ্যায় এরা নগণ্য। কিন্তু আমরা—যারা বুদ্ধিজীবী তারা ভালোই বাসি, ভালবাসায় অথচ আমাদেব আস্থা নেই, সে সুযোগ আমাদের ঘটে না। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত মার্জ্জিত রুচিব মধ্যে দিয়ে আমরা অবিশ্বাসের পূজা করেচি, আমরা 'সিনিক্।' সেই ঈশপের গল্পের শেয়াল আমরা, আমরা আঙ্গুরের আস্বাদ পেলাম না, আঙ্গুর আমাদেব কাছে টক। মনে মনে যেটা সত্য বলে জানি, মুখে তার প্রবল প্রতিবাদ কবচি আমরা। আমাদের গুরু কাইসারলিং বয়েচেন আমাদেব মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে, রয়েচেন বার্টরাণ্ড রাসেল, আলডুস হাক্সলি—মানস-অরণ্যের আবও কত নব নব দিশারী। পথ দেখাচ্চেন তাঁরা আমাদের: প্রেম নেই, প্রেম নেই—পৃথিবীতে প্রেমের পবমায়ু ফুরিয়ে গিয়েচে, ফুলে আর সুগন্ধ নেই, রূপোলী চাঁদ নিভে একরাশ শিশে হয়ে গিয়েচে। পৃথিবীর মানুষ সেই মুমূর্ষু প্রেম আর মরে যাওয়া, ঠাণ্ডা, ভারি শিশের চাঁদকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। প্রেম নেই, প্রেম নেই।

প্রেম নেই, অথচ আমরা আছি, পৃথিবী আছে—বিস্তীর্ণ পৃথিবী আর

বিপুল জনারণ্য। নেই শুধু প্রেম। কিন্তু কতকগুলি মুহূর্ত্ত আছে, মধুর, স্বপ্নময় কতকগুলি মুহূর্ত্ত। অতি নিভৃত, অতি সংক্ষিপ্ত কতকগুলি মুহূর্ত্ত। তখন পৃথিবীতে আবার রূপোলী চাঁদ ওঠে, মানস-সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভেসে আসে বাতাসের বন্যা, সমস্ত রাত্রি যেন রজনীগন্ধার মতো সুরভিত হয়ে ওঠে—যুক্তি তর্ক দিয়ে কিছুতে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে গল্পের দৈত্যের মতো এসে অতীতের প্রেত আমার ক্ষণকালের সেই পৃথিবীকে ভেঙে চুরে একাকার, কদাকার করে দিয়ে যায়···

তাইতো মনে হয়, ভুল করেচি, ভুল পথে চলেচি আমরা। আমরা বিষ নিয়ে গেলাম কণ্ঠ পরিপূর্ণ করে, অমৃতের পাত্র রইলো আয়ত্তের অতীত হয়ে। কিন্তু অমৃত রইলো, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রেম রইলো, শুধু নতুন যুগের মানুষ হয়তো তার সবটুকু স্বাদ পেল না। ললিতা যদি সেই অমৃতের সন্ধান পেয়ে থাকে, আমরা আমাদের সংশয়-সন্দিগ্ধ মন দিয়ে তার পথ আগলাবো কেন? আমাদের গণ্ডীর বাইরে থাক ললিতা, দুঃখের রাত্রি শেষ হোক, চাঁদ উঠুক তাদের আকাশে। সুকুমার যেন তাকে জীবনের সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করতে পারে।

তোমার আমার মনে বিষের ক্রিয়া সুরু হয়েচে এক পুরুষ আগে থেকে। আমাদের পথও তাই আলাদা। ললিতাকে আমাদের সঙ্গে টানতে গেলে তার প্রতি শুধু অত্যাচার করাই হবে। মানুষের যে পরম সুন্দর কামনা কবিতা ও কল্পনাকে স্বপ্নে আর সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত করে রেখেচে, তার পূর্ণ অপমৃত্যু যে আজও ঘটেনি, ললিতা তার প্রমাণ হয়ে থাকনা কেন!······

শেষ

২৩।।

৮৩
আ.মু.-৩২

শ্রীযুক্ত প্রেমলাল মুখোপাধ্যায়

মদন ভস্মের পর-

৩৫।৭৭